সোভিয়েত দেশে অধ্যয়ন
(১৯৭৬-১৯৮৬)
স্মৃতিময় দিনগুলো ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা

ইন্দ্রজিৎ রায়

২০২৪

লেখক পরিচিতি

ইন্দ্রজিৎ রায় ১৯৫৬ সালে নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে মোহনগঞ্জ পাইলট হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক ও ১৯৭৪ সালে ময়মনসিংহের সরকারী আনন্দমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন । এরপর ১৯৭৬ সালে সোভিয়েত সরকার-প্রদত্ত বৃত্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে গমন করেন। তিনি বর্তমান রুশ ফেডারেশনের ক্রাসনাদারে অবস্থিত কুবান রাষ্ট্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষে ১৯৮২ সালে কৃষিতত্ত্বে মাস্টার্স ও ১৯৮৬ সালে উদ্ভিদ প্রজনন ও বীজ উৎপাদনে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে দেশে ফিরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে যোগদান করেন এবং সেখানে ২০০১ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দফতরে প্রকল্প বিশ্লেষণের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৯৯ সালে জাপানের ফুকুওয়াকাতে অবস্থিত কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা করেন। ২০০১ সাল থেকে তিনি কানাডার টরন্টোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তিনি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কৃষি গবেষণা ও গ্রামীন উন্নয়ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং দুই পুত্র সন্তানের জনক।

ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়ন নামটি উচ্চারিত হতেই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে এমন একটি দেশের উজ্জ্বল ছবি যা ছিল বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আশাজাগানিয়া, ছিল সারা বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মুক্তিকামী জনগণের নির্ভরযোগ্য ভরসাস্থল। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার খুব কম দেশই আছে যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য সহযোগিতার হাত পৌছে নি। এ সাহায্য ছিল মুক্তিকামী জনগণের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের নিগড় থেকে মুক্ত হওয়ার আন্দোলনকে সমর্থন প্রদান এবং পরবর্তীতে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করে তাদের স্বাধীনতাকে সুসংহত করা I আজকের অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীন ও উদীয়মান অনুরূপ শক্তি ভারতও সোভিয়েত সহায়তার উপকারভোগীদের অন্যতম। ১৯৭১ সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার ঊষালগ্নে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্মের অনেকের মত আমারও স্বপ্ন ছিল সোভিয়েত দেশে পড়াশুনা করার। সেই স্বপ্নটি দানা বাঁধতে শুরু করে যখন ১৯৭২ সাল থেকে সোভিয়েত সরকারের বৃত্তি নিয়ে বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার্থে সে দেশে যেতে শুরু করে। ভাগ্যক্রমে ১৯৭৬ সালে আমারও এরকম একটি সুযোগ এসে যায়। এই গ্রন্থটিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষাসূত্রে আমার এক দশক অবস্থানের স্মৃতিময় দিনগুলোর বিচিত্র অভিজ্ঞতা সে দেশের তৎকালে বিরাজমান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জীবনবোধের আলোয় রাঙিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। ছাত্রজীবনের ঘটনাবহুল দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকানোর পাশাপাশি সোভিয়েত রাষ্ট্রের উত্থান, সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন, কাল পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় সোভিয়েত সমাজে সংকটের উদ্ভব, ও সংকট নিরসনে নেতৃত্বের ব্যর্থতার জের ধরে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিলুপ্তির পথে যাত্রা – এসব বিষয়গুলোও আলোচনায় এসেছে।

১৯৭৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পর ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে ভর্তি হই ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি প্রকৌশল অনুষদে। থাকতাম নাজমুল আহসান হলে। খুব সম্ভবত ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে কোন একদিন লাইব্রেরীতে পড়ার সময় টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটি পত্রিকায় বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের সোভিয়েত সরকার প্রদত্ত বৃত্তিগুলোর বিজ্ঞপ্তি দেখে আবেদন করি। কিছুদিন পর নির্বাচনী পরীক্ষার চিঠি আসে। ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হয় তেজগাঁও টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটউটে। কৃষি বিষয়ে চার-পাঁচটি স্লটের জন্য বোধ হয় ৭০ জন প্রার্থী হাজির ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ইন্টারভিউতে বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়ে যাই। এরপর আগস্ট মাসে কোন একদিন রেডিয়োতে ঘোষণা আসে যারা সোভিয়েত বৃত্তিগুলোর জন্য নির্বাচিত হয়েছে তারা যেন ঢাকায় পাসপোর্ট অফিসে রিপোর্ট করে। ফার্মগেটের ইন্দিরা রোডে তখন পাসপোর্ট অফিস, সেখানে আসার পর কোন ঝামেলা ছাড়াই বিনামূল্যে আমাকে গ্রাটিস পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। এরপর ভিসার জন্য আবেদন। সোভিয়েত ইউনিয়নের দূতাবাস গুলশানের নিভৃত পল্লীতে। দূতাবাসে এসে ফরম পূরণ করে ভিসার আবেদন করি। ভিসার সঙ্গে একটি চিঠিও দেয়া হয়। এই চিঠি নিয়ে শাহবাগে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থিত সোভিয়েত বিমান সংস্থা "এরোফ্লোত" অফিসে যাই। সেখানে ঢাকা-মস্কো রুটে একটি বিমান টিকেট ইস্যু করা হয়।

এভাবে এক সপ্তাহের মাঝেই পাসপোর্ট-ভিসা-টিকেট হয়ে যায়। ধরমপাশায় আমাদের সদ্য-স্থানান্তরিত বাড়ীটি ও ছোট ভাইবোনদের অনেকদিনের জন্য ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছিল। মা ও বড়দা আমার সঙ্গে ঢাকায় আসে। বাবার সঙ্গে শেষ দেখা মোহনগঞ্জ রেল স্টেশনে। ১৯৭৬ সালের ২৩শে আগস্ট বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তেজগাঁও বিমান বন্দরে মায়ের অশ্রুসজল মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে পাসপোর্ট কন্ট্রোল পার হয়ে যাই। কিছুক্ষণ পর এরোফ্লোতের তুপোলেভ-১৫৪ বিমানটি আমাদের নিয়ে আকাশে ডানা মেলে। জানালার ধারে সিট ছিল। দেখতে দেখতে রাজধানী ঢাকার শহর রেখা মিলিয়ে গেল। ওপরে উঠতে উঠতে বিমানটি এক সময় মেঘের রাজ্যে হারিয়ে যায়। চোখ বুঁজে থাকি অনেকক্ষণ। বিমানের ভেতর কোলাহল ও হৈ চৈ। অধিকাংশ যাত্রী আমার মত মস্কোগামী ছাত্র। ঘন্টা তিনেক উড্ডয়নের পর বিমানটি বোম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখানে আধঘন্টা বিরতির পর আবার যাত্রা, মধ্যরাতের পর বাগদাদ বিমানবন্দরে অবতরণ। সেখানেও কিছুক্ষণ বিরতি।

তখনকার দিনে দূরপাল্লার বিমানযাত্রায় নন-স্টপ ফ্লাইট ছিল না। এভাবে উড়তে উড়তে পরদিন কাকডাকা ভোরে আমাদের বিমানটি মস্কোর শেরেমেতেভো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভূমি স্পর্শ করে। বিমানের সিঁড়ি বেয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-উত্তেজনায় শিহরিত হয়েছিলাম। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল, লেনিনের দেশ, পুশকিন-গোর্কির দেশ,

সর্বোপরি মহান মুক্তিযুদ্ধে অকুন্ঠ সমর্থন দানকারী সোভিয়েত রাশিয়ার মাটিতে পদার্পণ করেছি। বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বাইরে বেড়িয়ে আসি। এরাইভ্যাল হলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র সংগঠন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ - ডাবলু ভাই, আলী নকী ভাই, আশরাফ ভাই সহ আরো অনেকে। আমাদের তারা আলিঙ্গন করে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালেন ও বাংলায় লেখা কিছু অতি প্রয়োজনীয় রুশ শব্দ ও বাক্যের একটি কাগজ ধরিয়ে দিলেন। তারা আমাদেরকে সঙ্গে করে টার্মিনাল ভবনের বাইরে বেরিয়ে এলেন, যেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল বাস। যদিও তখন মস্কোতে গ্রীষ্মকাল, সে দিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন ও আর হিমেল বাতাসের মৃদু প্রবাহ। শীত অনুভূত হচ্ছিল। সবার বাসে চড়া শেষ হলে নকী ভাই অপেক্ষমান বাসচালককে রুশ ভাষায় বললেন, "পাইয়েখালি (রওনা হলাম)"। শহর অভিমুখে বাস দ্রুত ছুটতে থাকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে মস্কোর পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত রাস্তাঘাট ও ঘনসবুজে আচ্ছাদিত প্রকৃতির দৃশ্য উপভোগ করতে থাকি। ঘন্টাখানেক পর বাস মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হোস্টেলের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমরা বাস থেকে নেমে যাই।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়, মস্কোতে সূচনা

আমাদের জন্য হোস্টেলে রুম বরাদ্দ ছিল। সবাই যে যার মালপত্র নিয়ে হোস্টেলে ঢুকল। এক রুমে তিনজন করে ছিলাম। কে আমার সঙ্গে ছিল মনে নেই, তবে আবছা আবছা সুজিতের (সুজিত কুমার বালা, অধ্যাপক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) কথা মনে পড়ছে। দীর্ঘ বিমান যাত্রার ক্লান্তি দূর করতে কিছুক্ষণ বিছানায় উপুর হয়ে পড়ে থাকলাম। হঠাৎ দরজায় টোকা, হোস্টেল কর্তৃপক্ষের একজন আমাদের ক্যান্টিনে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে বললেন। আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। এক বড় ভাই সঙ্গে ছিলেন, ক্যান্টিন খুব বেশি দূরে নয়, হাঁটা পথ। মেঘলা আকাশ, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল, গ্রীষ্মকালের প্রায় শেষ, তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মত, বেশ ঠান্ডা লাগছিল। ক্যান্টিনে ঢুকে চমকে গেলাম। আমাদের মতই বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নতুন ছাত্ররা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। অধিকাংশই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আসা। ভেতর থেকে ভেসে আসছে অপরিচিত ঘ্রাণ, রুশ ভাষা না জানার কারণে খাবারগুলোর নাম জিজ্ঞেস করাও সম্ভব হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত টুকরো রুটি, ডিমের অমলেট আর চা দিয়েই আহার শেষ করতে হলো। হোস্টেলে ফিরে আসার পর আমাদের নিচতলায় নিয়ে যাওয়া হলো হেলথ চেক আপের জন্য। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রায় উলঙ্গ করে কমপ্রিহেনসিভ হেলথ চেকআপ। এভাবে দিনটি কেটে যায়। পরদিন খুব ভোরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। সোভিয়েত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা রুমে ঢুকলেন, তার সঙ্গে আমাদের একজন বড় ভাই, খুব সম্ভবতঃ আশরাফ ভাই ছিলেন। আমাদেরকে বলা হল ক্রাসনাদার যেতে হবে। আমাদেরকে ভর্তি করা হয়েছে কুবান কৃষি ইনস্টিউটে; তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ইনস্টিউট/আকাদেমি নামে অভিহিত হতো।

মনটা খারাপ হয়ে গেল, অনেক আশা ছিল মস্কো, লেনিনগ্রাদ এসব বড় শহরে পড়ব। আশরাফ ভাই বুঝিয়ে বললেন তোমরা যেহেতু কৃষি পড়তে এসেছ, তার জন্য ট্রপিক্যাল ক্লাইমেটের উপযোগী ক্রাসনাদারের ওই বিশ্ববিদ্যালয়টি সোভিয়েত ইউনিয়নের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া মস্কোর মত শীত পড়ে না সেখানে, তোমাদের ভাল লাগবে। মনকে প্রবোধ দিলাম,সাইবেরিয়া ত আর নয়। খুব তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পড়ে তৈরি হয়ে নিলাম। নিচে লবিতে এসে দেখলাম ক্রাসনাদার যাওয়ার জন্য অন্যেরাও বসে আছে। আমাদের নিয়ে বাস নিয়ে রওনা হল মস্কোর কাজান রেলস্টেশন অভিমুখে। মেঘমুক্ত আকাশ, চারদিক সোনালী রোদ্দুরের হাসিতে উজ্জ্বল। রেলস্টেশনে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগে নি। শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তা আমাদের হাতে ট্রেনের টিকেট ধরিয়ে দিলেন এবং পথ খরচের জন্য কিছু রুবল দিলেন। ট্রেনে চড়ে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। কার্পেট মোড়ানো রাজসিক স্লিপার কোচ, প্রশস্ত কামরা, প্রতি কামরায় ধবে ধবে সাদা চাদর মোড়ানো দুটি বেড ও বালিশ যাতে আরাম করে শোয়া যায়। ট্রেনে মোটেও ভিড় নেই। খাবারের জন্য আলাদা রেস্টুরেন্ট কার। এক বগি থেকে আরেক বগিতে যাওয়া যায়।

ট্রেন চলতে শুরু করে। আমরা নিজেদের মধ্যে পরিচিত হতে শুরু করলাম। খুব সম্ভবতঃ আমরা পাঁচ জন ছিলাম। আমি, খলিল (ডঃ খলিলুর রহমান, সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিউট), মোস্তফা (প্রফেসর এ কে এম মোস্তফা জামান, সিনিয়র অধ্যাপক, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), হারুন (ডঃ হারুনর রশীদ, উপাচার্য, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং জহির (ডঃ জহিরুল ইসলাম, সাবেক মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিউট)। অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে সময় লাগে নি। জানা গেল, খলিল ও আবুল (মোস্তফা) বরগুনার, হারুন বরিশালের উজিরপুরের আর জহির সিরাজগঞ্জের। চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকি বিস্তীর্ণ রুশ প্রান্তরের দিকে। জনবসতি কম, রেল লাইনের দুধারে মাঝে মাঝে লোকালয়গুলো খুব দ্রুত মিলিয়ে যায়। বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেন থামে। কোনটির নাম মনে নেই, শুধু খারকভ ছাড়া,

ইউক্রেনের বড় শিল্প শহর। এক সময় সবাই মিলে খেতে যাই। খাওয়ার পর ঐতিহ্যবাহী রুশ সামাভার থেকে ঢেলে চা খাওয়ার কথা মনে আছে। দিনের পর রাত নেমে আসে। প্রায় এক হাজার মাইলের ট্রেন যাত্রা। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। রুশ ভাষা না জানার কারণে স্থানীয় যাত্রীদের সঙ্গে মৃদু হাসি ছাড়া ভাব বিনিময়ের কোন সুযোগ ছিল না। বড় ভাইদের দেয়া বাংলায় লেখা কিছু রুশ শব্দের শিটটি থেকে কিছু রুশ শব্দ উচ্চারণ করলেও তা বোধগম্য হত না।

পরদিন দুপুরের পর ট্রেনটি ক্রাসনাদার রেলস্টেশনে এসে পৌছে। প্লাটফরমে অবতরণ করার পর ইনস্টিটিউটের একজন কর্মকর্তা হাসিমুখে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন, তার সঙ্গে ছিলেন ক্রাসনাদারে অধ্যয়নরত আমাদের বড় ভাইরা। হামিদ ভাই (হামিদ হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর),সুবাস দা (ড: সুবাস দাশগুপ্ত, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এশীয় আঞ্চলিক অফিসের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তা), মানস দা (মানস কুমার সাহা, অবসরপ্রাপ্ত মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিউট) এবং আরো কয়েকজন। ইনস্টিউট থেকে পাঠানো বাসে ওঠে আমরা বসলাম। বড় ভাইরা নানা বিষয়ে আলাপের সূত্রপাত করে গাইডেন্স দেয়া শুরু করলেন। মানসদার একটি উক্তি আমার জন্য উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে আছে। আমার মাথায় মাফলার পেঁচানো ছিল। এটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, এই যে ভাই মাফলারটি খুলে ফেলেন, এদেশে পুরুষরা এভাবে মাফলার পড়ে না, মেয়েরা এভাবে মাথায় রুমাল পেঁচায়। মানসদার উক্তিতে আমি সচকিত হই এবং চট করে মাফলারটি খুলে ফেলি। এর কোন প্রয়োজনও ছিল না, ক্রাসনাদারে তখন রীতিমত গ্রীষ্মকাল। বিশ-পচিশ মিনিট পর আমাদের নিয়ে বাসটি ইনস্টিউটের ক্যাম্পাসে ঢুকে এবং বিদেশী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত চার নম্বর ছাত্রাবাসের গেটের সামনে এসে দাড়াঁয়। বাসের দরজা খোলামাত্র আঠার-উনিশ বছর বয়সের একদল কিশোর হুড়মুড় করে নেমে পড়ে। এভাবেই সমাপ্তি ঘটে এক বাড়ী ছেড়ে এসে আরেক বাড়ীতে ঢোকার গল্পের। নতুন দেশে জীবন শুরু হওয়ার প্রাক্কালেই ছোঁয়া লাগে দেশটির আলাদা জীবনবোধ ও স্বতন্ত্র সমাজ বৈশিষ্ট্যের। মস্কোর শেরেমেতেভো বিমান বন্দর থেকে প্রায়-কূটনৈতিক প্রটোকল মেনে সারা পথ আগলে রেখে আমাদেরকে নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া হয়। এটি যদি কোন পূঁজিবাদী দেশ হত, তাহলে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করেই গন্তব্যে পৌঁছতে হত, যেখানে অঘটন ঘটার সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়া যায় না।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়, প্রস্তুতি পর্ব, চার নম্বর ছাত্রাবাস

চার নম্বর ছাত্রাবাসটি ছিল নবাগতদের জন্য। আমি, খলিল ও আবুল তিনজন একসঙ্গে থাকার জন্য দোতালার ৩৬ নং কক্ষ বেছে নিলাম। হারুন ও জহির খুব সম্ভবত ৩১ নং কক্ষে ঢুকে। একটু গোছগাছ করার পর বড় ভাইরা আমাদের নিয়ে বের হলেন। প্রথমেই রাস্তা পেরিয়ে ক্যান্টিন। দোতালায় উঠে ট্রে হাতে নিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। প্লেটে করে কি কি খাবার নিয়েছিলাম মনে নেই। তবে খাবার শেষ হয়ে যাবার পর ট্রের ওপর প্লেটগুলো রেখে ট্রেটি চলমান কনভেয়র বেল্টের ওপর রেখে দেই ধোয়ার জায়গায় পৌছেঁ দেয়ার জন্য। বড় ভাইদের নির্দেশনায় এভাবে শুরু হয় আমাদের স্থানীয় কালচার রপ্ত করার প্রক্রিয়া। ক্যান্টিন থেকে বের হয়ে পত্রিকা বেচার দোকানটি (কিয়স্ক) পাশ কাটিয়ে ডান দিকের রাস্তাটি ধরে সামনে একটু হেঁটে যাই ১০ নম্বর হোস্টেলে। এটি ছিল আমাদের বড় ভাইদের আস্তানা। (১৯৭৬ সালে তোলা উপরের ছবিটিতে চার নম্বর ছাত্রাবাস সবার ডানে, মাঝখানে ক্যান্টিন, বাঁ দিকে কিয়স্ক)।

প্রথমেই পরিচয় হয় অসীমদা (ডঃ অসীম দে সরকার,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্রে দীর্ঘদিন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে কর্মরত থেকে গত শতাব্দীর শেষ দিকে প্রবাসী হন) ও হাবিব ভাই (ডঃ হাবিবুর রহমান, বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে পরিচালক পদে কর্মরত থেকে অবসরপ্রাপ্ত)- এর সঙ্গে। তারা ছিলেন সবচেয়ে সিনিয়র ১৯৭২ সালের প্রথম ব্যাচের ছাত্র, দুজন একই রুমে থাকতেন। অন্য রুমে থাকতেন হামিদ ভাইয়ের ব্যাচমেটরা - নন্দীদা (ড:পরমেশ নন্দী, বন গবেষণা ইনস্টিউটের মুখ্য গবেষক পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর ইউএনডিপি-র প্রকল্প পরামর্শক), আনসার ভাই (আনসার আলী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে দীর্ঘদিন কর্মরত থেকে প্রকল্প পরিচালকের পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত)। একমাত্র বোন ছিলেন সুবাসদা-মানসদা-তোফাজ্জল ভাই (ইপসা-র সাবেক অধ্যাপক, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী)-দের ব্যাচমেট ফাতেমা আপা (ড: ফাতেমা খাতুন, বিএআরআই-এর ডাল ও তৈলবীজ বিভাগে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে কর্মরত থেকে কানাডা প্রবাসী)।

ঢাকা থেকে আমাদের পরের এরোফ্লতের ফ্লাইটটি ধরে আগস্টের ২৬-২৭ তারিখে ক্রাসনাদার পৌছায় আমাদের আরো চারজন সতীর্থ - আবু তাহের খান (আমাদের মাঝে সবচেয়ে সরল মনের হাসিখুশি মানুষ, যে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছে বছর পাঁচেক আগে), রহমান (ডঃ আবদুর রহমান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ, বিএআরআই-এ মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পরিচালক পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত)), শাহজাহান (ড: মো: শাহজাহান, বিএআরআই-তে দীর্ঘদিন কর্মরত থেকে অবসর নিয়ে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহে সিনিয়র পরামর্শক) ও খান জহির (জহিরুল ইসলাম খান, তার সাথে কোন যোগাযোগ নেই)। এরাও চার নম্বর ছাত্রাবাসে উঠে। ক্লাশ শুরুর তারিখ ১লা সেপ্টেম্বর, আরো কিছুদিন বাকী। এর মাঝে বড় ভাইদের কেউ একজন এসে বললেন তোমরা যদি চাও তা হলে কাছাকাছি একটি যৌথ খামারে ফসল তোলার সুযোগ আছে এবং এ জন্য পারিশ্রমিক ও দেয়া হবে। সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম।

আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একটি আংগুর (রুশ ভাষায় “ভিনোগ্রাদ”)ক্ষেতে। বিশাল মাঠ, ফার্মের একজন কর্মকর্তা দেখিয়ে দিলেন কিভাবে আংগুর পাড়তে হবে এবং বললেন যত খুশী খেতে পার। আমাদের ছোটবেলায় আংগুর আজকালের মত সহজলভ্য ছিল না। দোকানীরা আংগুরের থোকা সুতায় ঝুলিয়ে বিক্রী করত, কেউ চাইলে কাঁচি দিয়ে সযত্ন কেটে তুলার ওজনে বিক্রী করত। সেই আংগুর নাগালে পেয়ে যত না গাছ থেকে পাড়া, তার চেয়ে বেশি খাওয়া। খেতে খেতে পেট খারাপ হওয়ার জোগাড়। এর দুদিন পর তরমুজ পাড়ার জন্য আমাদের নিয়ে যাওয়া হল, তরমুজ ক্ষেতেও একই অবস্থা। এ রকম খাওয়ার চোটে খুব দ্রুত আমাদের অবয়ব বদলে যেতে শুরু করে। ক্লাশ শুরু হওয়ার দু-তিনদিন আগে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় ইনস্টিউটের প্রস্তুতিপর্বের (প্রিপারেটরি) ফ্যাকাল্টিতে। ডিন নিকোলাই মাতভেইয়েভিচ সোবল আমাদের ব্রিফিং দেন। অত্যন্ত সপ্রতিভ চেহারার ডিন ছিলেন ইংরেজিতে পারদর্শী। তিনি বললেন সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়তে আসা বিদেশী ছাত্রদের জন্য প্রস্তুতি পর্ব প্রথম সোপান। এখানে এক বছর রুশ ভাষা ও বেসিক সায়েন্স পড়তে হবে। তারপর বিষয়-ভিত্তিক কোর্সে পাঁচ বছর পড়ার পর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেয়া হবে, আলাদা কোন স্নাতক ডিগ্রীর ব্যবস্থা ছিল না। তিনি আমাদের সতর্ক করে বললেন প্রস্তুতি পর্ব এক চান্সে পাশ করতে হবে। এটি পুনরাবৃত্তির কোন সুযোগ নেই। যারা ফেল করবে তাদের ইউনিভারসিটির পরিবর্তে "টেকনিকুমে" পাঠানো হবে। টেকনিকুম বাংলাদেশের পলিটেকনিক ইনস্টিউটগুলোর মত, তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স। মিটিং থেকে বের হয়ে আমরা বেরিয়ে আসলাম। রুশ ভাষার মাথা-মুন্ডু কিছুই জানিনা। এই ভাষায় সব পড়ে এক চান্সে পাশ করতে হবে। একটু দূঃশ্চিন্তা ভর করলেও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা চলে ক্লাশ শুরুর।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়, প্রস্তুতি পর্বের শুরু

ক্রাসনাদার পৌঁছার এক সপ্তাহ পর শুরু হয় আমাদের ক্লাশ। ১৯৭৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর, বুধবার। ক্লাস শুরু হওয়ার আগে অফিস পৌঁছে রুটিন (রাসপিসানিয়ে) টুকে নেই। প্রস্তুতি পর্বের সব ছাত্রই বিদেশী, দুটি সেকশন করা হয়। "এ"-সেকশনে বাংলাদেশের ছাত্রদের মধ্যে ছিলাম আমি, খলিল, জহির (ইসলাম), শাহজাহান ও রহমান। "বি"-সেকশনে বাংলাদেশ থেকে ছিল মোস্তফা, তাহের, হারুন ও জহির (খান)। রুটিনে নির্ধারিত শ্রেণীকক্ষে এসে আমরা বসলাম। বেল বাজল। প্রথম ক্লাশ রুশ

ভাষার। হাই হিল জুতো পড়া মাঝ বয়সী এক মহিলা ক্লাস রুমে ঢুকে মৃদু হেসে আমাদের রুশ ভাষায় সম্ভাষন জানালেন। আমরাও বললাম, "গুড মর্নিং, ম্যাডাম"। এটি শুনে একটু সিরিয়াস হয়ে ইংরেজিতে বললেন, স্যার বা ম্যাডাম সম্বোধন করা আমাদের কালচার নয়। নাম ধরে ডাকতে হবে। আমার নাম লুদমিলা পাভলোভনা স্মিরনোভা। তোমরা আমাকে লুদমিলা পাভলোভনা বলে ডাকবে। থতমত খেয়ে গেলাম, গুরুজনকে নাম ধরে ডাকতে অস্বস্তি লাগছিল, কিন্তু উপায় নেই। তারপর তিনি একে একে সবার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করলেন। আমাদের নামগুলো উচ্চারণ করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু গোল বাধল শাহজাহানকে নিয়ে। কিছুতেই নামটি উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো ডাকবেন শাখমাদঝান বলে। পরিচয় পর্ব শেষ হলে তিনি বললেন তোমাদের আমি রুশ ভাষার মাধ্যমে রুশ ভাষা শেখাবো, ইংরেজির ব্যবহার হবে খুব সীমিত। এরপর তিনি ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর হাত রেখে বললেন "দাসকা", হাতে ধরা চক দেখিয়ে বললেন "মেল", টেবিলের ওপর হাত রেখে বললেন "স্তল", চেয়ারের দিকে আংগুল দেখিয়ে বললেন "স্তুল", জানালার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বললেন "আখনো"। এভাবেই অভিনব ইনটেনসিভ পাঠদান পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে শুরু হয়ে যায় আমাদের রুশ ভাষা শিক্ষার প্রক্রিয়া। আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান ছিলাম যে, লুদমিলা পাভলোভনার মত একজন শিক্ষককে পেয়েছিলাম। (উপরে সত্তুর দশকে তোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবনের ছবি।)

রুশ ভাষার ক্লাশ শেষ হলে অন্য বিষয়গুলোর ক্লাশ শুরু হয়। এ সব বিষয়গুলো ছিল গণিত (মাতেমাতিকা), পদার্থবিজ্ঞান (ফিজিকা), রসায়ন (খিমিয়া), জীববিজ্ঞান (বিয়োলগিয়া) ও ইতিহাস (ইসতোরিয়া)। প্রথম দিন আর কি কি বিষয়ের ওপর ক্লাশ হয়েছিল মনে নেই, তবে গণিতের কথা মনে আছে। প্রস্তুতিপর্বের গণিত ক্লাশে যে স্যার ঢুকলেন, তাঁর নাম আলেকসান্দর ঝুকভ। পরিচয় পর্ব শেষ হলে তিনি কিছুটা রুশ ও তার সাথে ইংরেজি-ফ্রেঞ্চ মিশিয়ে পাঠ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। গণিত ভাষা-নিরপেক্ষ, শুধু টার্মগুলো ভিন্ন, তবুও অনুমান করা যায়। রুশ ভাষায় জ্যামিতি হল গিওমেত্রিয়া, ত্রিকোনোমিতি হল ত্রিগোনোমেত্রিয়া, লাইন হল লিনিয়া, সমীকরণ হল উরাভনেনইয়ে। লিনিয়ার ইকুয়েশন হল লিনেইনয়ে উরাভনেনইয়ে, কোয়াড্রাটিক ইকুয়েশন হল কভাদ্রাতিচেস্কোয়ে উরাভনেনইয়ে। ফাংশন হল "ফুংকৎসিয়া"। রুশ ভাষায় ইংরেজির মত "এক্স" বা "ওয়াই" অক্ষর নেই, সমীকরণ করার সময় অজানা রাশি X-র উচ্চারণ হত "ইক্স" এবং Y-র "ইগরিক"। এভাবে ভাষা জ্ঞানের স্বল্পতা সত্বেও রুশ ভাষার মাধ্যমে গণিত পাঠদানে আমরা অভ্যস্ত হতে থাকি। এরপর মধ্যাহ্নের বিরতি হয়। আমরা সবাই করিডোরে ভিড় জমাই। "বি"-সেকশনের বাংলাদেশী ছাত্রদেরও খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। তারাও তাদের রুশ ভাষার ম্যাডামকে নিয়ে খুব খুশী। তাঁর নাম ছিল নিনা আউরোনোভনা। তিনি খুব সম্ভবত ফ্যাকাল্টির ডিন নিকোলাই সোবলের স্ত্রী ছিলেন।

বিরতির পর বোধ হয় আরো দুটো বিষয়ের ওপর ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। রসায়নের টিচার ছিলেন একজন ম্যাডাম। তিনিও অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে পাঠ্যবিষয়ের অবতারণা করলেন। দেয়ালে একটি বড় আকারের "পিরিওডিক টেবিল" টাঙানো ছিল। টেবিলের দিকে পয়েন্টার নির্দেশ করে বললেন "পেরিয়দিচেস্কায়া তাবলিৎসা"। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হল না। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান এর আবিষ্কারক একজন রুশ বিজ্ঞানী। আমরা মাথা নাড়লাম। তিনি তাঁর নাম বললেন - দমিত্রি ইভানোভিচ মেনদেলইয়েভ। তারপর তিনি পিরিয়ডিক টেবিল থেকে একে একে মৌলগুলোর নাম বলা শুরু করলেন। মৌলের ইংরেজি নাম এলিমেন্ট আর রুশ ভাষায় এলিমেন্ত। হাইড্রেজেনের প্রতীক "এইচ"- এর দিকে তাকিয়ে বললেন "ভাদারোদ"(আক্ষরিক অর্থে জলের উৎপাদক), অক্সিজেন - কিসলারোদ (এসিডের উৎপাদক), কার্বন-উগলেরোদ (কয়লার উৎপাদক), সোডিয়াম (নাত্রি), পটাশিয়াম (কালি), ফসফরাস (ফসফর)। আমরা মনোযোগ টান টান করে শুনতে থাকি। এরপর ব্ল্যাকবোর্ডে জলের ফর্মূলা লিখলেন, আমরা চট করে বলে উঠলাম এইচ-টু-ও। তিনি স্মিত হেসে রুশ ভাষায় উত্তর দিলেন "আশ-দভা-ও"। রুশ ভাষায় "এইচ" ধ্বনিটি নেই। আমরাও টিচারকে প্রশ্ন করতে থাকি, নতুন ভাষায় জানা ধ্যান-ধারণাগুলো আবার নতুন করে উপলব্ধি করায় আগ্রহের কমতি ছিল না। এরপর বস্তুর ধারণা উত্থাপন করলেন। বস্তুর (সাবস্টেন্স) রুশ নাম "ভিস্যেস্তভো"। বস্তুর ভৌত অবস্থানগুলোর নাম বললেন: কঠিন (সলিড) -খিভিয়োরদি, তরল (লিকুইড) - ঝিদকস্ত ও গ্যাস - গাজাআবরাজনি। বাতাসের নাম ভজদুখ ও বায়ুমন্ডলের নাম আতমোসফেরা।

প্রথম দিনের সব বিষয়ের ক্লাসগুলো ছিল পরিচিতি ও পাঠ্যক্রমের ওপর একটি সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য। রসায়নের মত জীববিজ্ঞানেরও শিক্ষক ছিলেন একজন ম্যাডাম। এদের দুজনের কারো নাম মনে নেই। পদার্থবিজ্ঞানের টিচার ছিলেন একজন পুরুষ, চালচলনে বিজ্ঞানীর মত আচরণ ছিল। খুব একটা ফ্রেন্ডলি ছিলেন না। কিন্তু উদ্ভাবনী চিন্তায় ছিলেন খুবই প্রখর। আমরা স্কুল কলেজে যেভাবে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান পড়েছি, তা মূলতঃ যান্ত্রিক ও মুখস্থ বিদ্যা-নির্ভর। মুখস্থ-বিদ্যার ধার এমনই ছিল যে, বহুদিন আগে স্কুলে শেখা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি অবিকল মনে আছে : "বস্তুর ভরবেগ পরিবর্তনের হার উহার ওপর প্রযুক্ত

বলের সমানুপাতিক এবং বল যে দিকে কাজ করে ভরবেগের পরিবর্তনও সেইদিকে ঘটে"। ভরবেগ কি জিনিস,তা তলিয়ে দেখার ভাবনা আসে নি কখনো, যদিও জানতাম ভরের সঙ্গে বেগ গুণ করলে যে রাশিটি উৎপন্ন হয় তার নাম ভরবেগ। কিন্তু ভর হল "স্কেলার" রাশি ও বেগ হল "ভেক্টর" রাশি। এখন ভরবেগ স্কেলার না ভেক্টর হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। আমাদের বিদ্যার দৌড়ের এই দিকটি তাঁর নজর এড়ায় নি। একদিন তিনি আমাকে বললেন, দেখ তোমার যে গুণটি আমার ভাল লাগে তা হল "ফতোগ্রাফিচেস্কায়া পামইয়াত" অর্থাৎ ফটোগ্রাফিক মেমোরি। কিন্তু এটি অর্থহীন, যদি না মৌলিক চিন্তা করতে শেখো। ফিজিক্স স্যারের এই উক্তিটি আমার মনে দারুন রেখাপাত করে এবং সারা জীবনের জন্য পাথেয় হয়ে যায়। ক্লাশে পড়ানোর সময় তিনি আমাদের দিকে প্রশ্নের আকারে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতেন। গ্রাভিটেশন (মাধ্যাকর্ষণ) পড়ানোর সময় তিনি একদিন আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান ভূপৃষ্টেও ক্ষণিকের জন্য মহাশূন্যের মত ওজনহীনতার সৃষ্টি হয়। আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি করে সম্ভব? তিনি বললেন ভূমি থেকে লিফট যখন ওপরে উঠতে শুরু করে তখন মূহুর্তের জন্য আমরা ওজনহীন হয়ে যাই। আমাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে সমীকরণ কষে দেখিয়ে দিলেন। ফিজিক্স স্যারের চিন্তার মৌলিকতা আমাদের দারুন অনুপ্রাণিত করত। দূর্ভাগ্যক্রমে স্যারের নামটি ভুলে গেছি।

ইতিহাস পড়াতেন খামিদ ইয়াখেভিচ বেরেতার l তিনি ছিলেন ক্রাসনাদার রিজিওনের ভিতর অবস্থিত আদিগেই (ক্ষুদ্র জাতিসত্বা) স্বশাসিত অঞ্চলের অধিবাসী। আমরা নিজেদের মধ্যে তাঁকে হামিদ স্যার বলে ডাকতাম। রুশ ভাষায় "হ" অক্ষরটি নেই, তার পরিবর্তে "খ" ব্যবহৃত হয়। এভাবেই শুরু হয়ে গেল আমাদের প্রস্তুতি পর্বের শিক্ষা জীবন।

বলার অপেক্ষা রাখে না, মূল ফোকাস ছিল রুশ ভাষার ওপর। লুদমিলা পাভলোভনা আমাদেরকে খুব যত্ন করে পড়াতেন। ক্লাসের শেষে থাকতো একগাদা হোম ওয়ার্ক, রুশ ভাষায় যার নাম "দামাশনায়ে জাদানিয়ে"। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোষহীন। ক্লাসের শেষে হোস্টেলে ফিরে আমরা চারবন্ধু একসাথে হোমওয়ার্ক করতাম। আমাদের মাঝে হারুন বয়সে একটু বড়। তার কথাবার্তায় ফুটে ওঠত সে জীবনবোধে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। তাই তাকে আমরা "বড় মিয়া" নামে ডাকতে শুরু করি। নানা বিষয়ে বড় মিয়ার দেয়া সুচিন্তিত মতামত থেকে আমরা উপকৃত হয়েছি। কোন বিপদ আপদ হলে বলতাম বড় মিয়াই আমাদের ভরসা। গর্ব বোধ করি আমাদের প্রিয় হারুন বর্তমানে দেশের একটি প্রখ্যাত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর।

দিনের ক্লাশগুলো শেষ হয়ে যাবার পর সন্ধ্যায় লিংগুয়াফোন ল্যাবে শুরু হত ফোনেটিক্সের ওপর ক্লাশ। আমরা কানে হেডফোন লাগিয়ে ক্যাসেটে ধারণকৃত রুশ ভাষায় কথোপকথন শুনতাম শুদ্ধ উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি শিখতে। এভাবে রুশ ভাষা দ্রুত আমাদের আয়ত্বে আসতে থাকে। এক মাস পর থেকেই কাজ চালানোর মত রুশ শব্দ ভান্ডার ও ছোট ছোট বাক্য গড়ার কৌশল রপ্ত করে ফেলি। প্রাতিষ্ঠানিক রুশ ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিদেশী নবাগত ছাত্র ছাত্রীদের সোভিয়েত সমাজ জীবনের মূলধারায় নিমজ্জিত করার জন্য ছিল আরো আয়োজন। প্রতি দেশের ছাত্র ছাত্রীদের সংগে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য ইনস্টিউটের এক একটি অনুষদকে সে সব দেশের শিক্ষার্থীদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করা হত। রুশ ভাষায় এই অভিভাবকদের বলা হয় "কুরাতর", ইংরেজিতে "মেন্টর"। আমাদের সংগঠনটির নাম ছিল "বাংলাদেশ ছাত্র সংগঠন, সোভিয়েত ইউনিয়ন"। আমাদের মেন্টর ফ্যাকাল্টিটির নাম ছিল "ফলমূল ও শাকসব্জি চাষ" (রুশ ভাষায় ফাকুলতেত প্লদোওভোষ্যেভোদস্তভো)।
এই ফ্যাকাল্টির ছাত্র ছাত্রীরা আমাদেরকে প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায়, যেমন স্কুল, মিউজিয়াম, যৌথ খামার, কলকারখানা, এসব জায়গায় নিয়ে যেত। পরিচয় ঘনিষ্ট হলে অনেকে আমাদের তাদের গ্রামের বাড়ীতেও নিয়ে গেছে। বাড়ীর বৃদ্ধা মহিলারা, যাদের রুশ ভাষায় ডাকা হয় "বাবুশকা" (দিদিমা),তারা আমাদের রুশ ভাষা বলতে দেখে দারুন খুশী হতেন। বাড়ীর পাদভালে (বেজমেন্ট) ডেকে নিয়ে তাদের নিজ হাতে প্রক্রিয়াজাত করা বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার-পানীয়তে আপ্যায়িত করতেন। ইচ্ছে করেই এসব খাবারের নাম উহ্য রাখছি। এভাবেই এক ঘনিষ্ট বন্ধু একদিন তাদের ক্রাসনাদার থেকে দুঘন্টার পথ ককেশাস পাহাড়ের কোলে "আপশেরনস্ক" গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যায়। বাবুশকা আমাদের দেখে ভীষণ খুশী। অনেক কথাবার্তা হলো; এক রাত থেকেও ছিলাম তাদের গ্রামের বাড়ীতে। ফিরে আসার সময় বাবুশকা আবেগপ্রবণ হয়ে বলে উঠলেন, "সিনক, নি উইএজঝাই আত নাস। মি বুদেম তিবিয়া ঝেনিত না রুসকোই ক্রাসাভিৎসে"" অর্থাৎ "বাছা, তুই আমাদের ছেড়ে যাবি না, তোকে আমরা সুন্দরী রুশ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দেব"। এভাবেই সোভিয়েত দেশের মানুষ আমাদের আপন করে নেয়, আমরাও এক পর্যায়ে ভুলে যাই ভিন দেশে আছি।

ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে ইনস্টিউট চত্বরে আমরা ঘুরে বেড়াতাম। শহরের উপকণ্ঠে কুবান নদীর তীর ঘেঁষে কালিনিন স্ট্রিট এবং সেকেন্ড লাইন (ফতারায়া লিনিয়া) ও কালেয়ায়েভা স্ট্রিটের মধ্যবর্তী বিশাল জায়গা জুড়ে ইনস্টিউটের ক্যাম্পাস। ক্যাম্পাসে ৪০ হেক্টর জায়গা জুড়ে ছিল ডেনড্রারিয়াম, আমরা চলে আসার পর এটিকে বোটানিক্যাল গার্ডেনে রূপান্তর করা হয়। শহর থেকে দূরে গ্রামে মোট ১১ হাজার হেক্টর জায়গা জুড়ে ইনস্টিটিউটের দুটো ফার্ম - কুবান ও ক্রাসনাদারস্কোয়ে। ক্রাসনাদার শহর দক্ষিণ রাশিয়ার উর্বর কৃষি প্রধান প্রদেশ "ক্রাসনাদারস্কি ক্রাই"-এর রাজধানী। আমাদের ইনস্টিউটের গা ঘেষেঁই অবস্থিত ক্রাসনাদার কৃষি গবেষণা ইনস্টিউট; দানাদার শস্য গবেষণায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এই ইনস্টিউটের বিজ্ঞানী পাভেল লুকইয়ানেনকো উদ্ভাবিত শীতকালীন গমের জাত "বেজঅস্তায়া-১" বিশ্বব্যাপী গমের প্রজনন গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত একটি মূল্যবান কৌলিক উপাদান। অল্প দূরে "বেলাজোরনায়ে" গ্রামে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা ইনস্টিউট; এ ছাড়া ক্রাসনাদারে আছে একটি কেন্দ্রীয় তেলবীজ গবেষণা ইনস্টিউট সহ আরো কয়েকটি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

সারিবদ্ধ পাইন, বার্চ (বিরিওজা) ও পপলার (তোপল) গাছে ঘেরা সরু পথগুলো ধরে ইনস্টিউট চত্বরে ঘুরে বেড়াতাম। শরতের শেষ ভাগে রাশিয়ার অন্যত্র শীতের পদধ্বনি শোনা গেলেও, পুরো সেপ্টেম্বর-অক্টোবর জুড়ে ক্রাসনাদারে
গ্রীষ্মের দাপটে শরতকাল বিরাজমান। ঘন সবুজে ঘেরা পুরো ক্যাম্পাস। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ – এটি এতদিন ছিল পুঁথিগত জ্ঞান; এ দেশটি এখন আমাদের সামনে উন্মোচিত হতে থাকে। মানুষের জীবনযাত্রা, চালচলন, বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ভাস্কর্য, স্থাপত্য কলা সব কিছুতেই দেশটির আলাদা বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এর প্রতিফলন ছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বহনকারী পূর্ণ নামে – কুবানস্কি অরদেনা ক্রুদাভোবা ক্রাসনাভা স্নামেনি সেলস্কোখাজইয়াস্তভেন্নী ইনস্তিতুত (কুবান অর্ডার অব রেড ব্যানার লেবার এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট)। মূল ভবনের সামনে পাইন গাছের সারিতে আচ্ছাদিত সরু রাস্তার পাশে ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্নদ্রষ্টা ও কালজয়ী দার্শনিক কার্ল মার্কসের স্মৃতিস্তম্ভ। কিছুদূরে বিপরীত দিকে ছিল রুশ বিপ্লবের রূপকার ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সমূহের ইউনিয়ন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের স্মৃতিস্তম্ভ। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বৈষম্যবিহীন সমাজের চিত্র ফুটে উঠত মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায়। শ্রম (কায়িক বা মেধাভিত্তিক) জীবিকা অর্জনের একমাত্র আইনানুগ উপায় হওয়ার কারণে আয় বন্টনের ক্ষেত্রে তারতম্য থাকলেও তা পুঁজিবাদী বিশ্বের ০.১%/ ১% বনাম বাকী ৯৯% এর মত আকাশ-পাতাল ব্যবধান ছিল না। উপচে পড়া বিলাসিতা ও ভোগবাদিতা ছিল অনুপস্থিত। রাস্তাঘাটে কখনো কোন ভিক্ষুক দেখা যেত না।

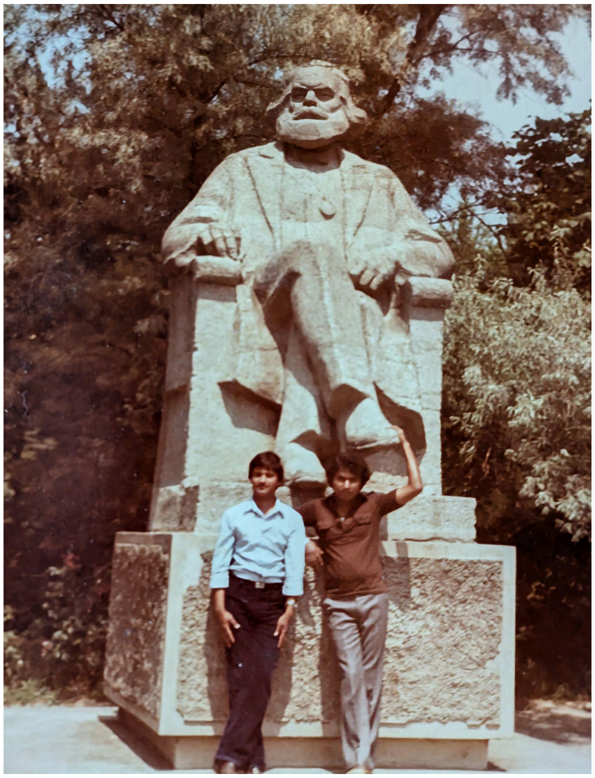

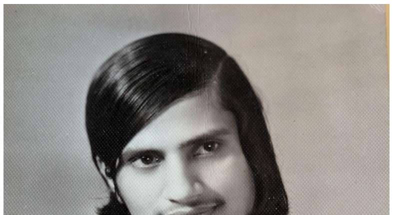

দুমাসের ক্লাশে রুশ ভাষা শিক্ষায় আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। বেসিক সায়েন্সের ক্লাশগুলোতে রুশ ভাষায় নোট নিতে কোন অসুবিধা হত না। বড় ভাইদের ওপর নির্ভরতা কমতে থাকে। ট্রলিবাস (ত্রলেইবুস) ও ট্রামে (ত্রামভাই) চেপে শহরে একা একা ঘোরাঘুরি ও কেনাকাটা করতে পারি। রুশ ভাষার শিক্ষক লুদমিলা পাভলোভনা ততদিনে ব্যাকরণের প্রথম ধাপটি শেষ করে জটিল বাক্য গঠন ও কমপ্রিহেনসনের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আসন্ন বার্ষিকীকে সামনে রেখে তিনি রুশ বিপ্লবের পটভূমি ও বিপ্লব সংগঠনের ঘটনাবলী নিয়ে নিয়ে লেখা ছোট ছোট প্যারাগ্রাফ দিয়ে আমাদের কমপ্রিহেনসিভ টেস্ট করাতেন। কয়েকবার পড়ে যেতেন, আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম, তারপর প্রশ্ন করলে উত্তর দিতাম। একদিন ঘটল বিপত্তি। লুদমিলা পাভলোভনা লেনিনের জীবনী নিয়ে একটি ছোট গল্প আমাদের পড়ে শোনালেন। তারপর শুরু হল প্রশ্নোত্তর পালা। আমাদের জহির, ক্লাসে সবসময় একটিভ থাকত, বলা নেই কওয়া নেই, হাত উঁচিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে উঠল, "লেনিন দুমাল, স্তো অন সামি উমনি চেলাভেক ভ মিরে, অর্থাৎ লেনিন মনে করতেন তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক।" ম্যাডাম এটি শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন, কিছুটা রেগে জহিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন আমাদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব, ভবিষ্যতে তাঁকে নিয়ে কখনো এ ধরনের মন্তব্য করবে না। জহির বিব্রত বোধ করে মাথা নিচু করে বসে রইল, আমরা মুচকি মুচকি হাসছিলাম।

অন্য বিষয়ের ক্লাসগুলোও যথানিয়মে চলতে থাকে, শুধুমাত্র ভাষা ছাড়া সেখানে নতুন কিছু ছিল না, তবুও গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান পড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ব্যতিক্রমধর্মী এপ্রোচ ভাল লাগত। এভাবেই নভেম্বর মাস এসে যায়। গাছের পাতাগুলো বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়তে শুরু করে, দ্রুত গ্রীষ্মের আমেজ হারিয়ে যায়। একদিন প্রস্তুতি ফ্যাকাল্টির একজন শিক্ষক আমাদের শহরে একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে নিয়ে গেলেন শীতের কাপড়চোপড় কিনে দেয়ার জন্য। আমরা দোকানের ভিতর ঢুকে নিজেদের সাইজ অনুযায়ী বেছে নিতে শুরু করি: ওভারকোট (পালতো), গরম টুপি (শাপকা বা শ্লয়াপা), জুতা (তুফলি ও বাতিনকি),হাতের গ্লোভস (পেরচাতকি)ও অন্যান্য পোশাক।
সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন জাতীয় উৎসবে আমাদের অংশ নেয়ার প্রথম সুযোগ আসে ৭ই নভেম্বর। ওই দিন ছিল মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৫৯-তম বার্ষিকী। এই দিনটি উদযাপনের মূল আকর্ষণ ছিল মিছিল ও শোভাযাত্রা। সকাল থেকেই উৎসবমুখর ভাবগম্ভীর পরিবেশে ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে জনগণ সমবেত হতে শুরু করে। আমরাও আমাদের ইনস্টিটিউটের ব্যানারে মিছিলে যোগ দেই। মিছিলটি শহরের মূল রাজপথ ক্রাসনায়া স্ট্রিটে ঢোকার পর অন্যান্য জায়গা থেকে আসা জনতার মিছিলে মিশে যায়। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর ক্রাসনাদার প্রদেশ সরকার ও পার্টি কর্তৃপক্ষ নির্মিত মঞ্চ থেকে জনতার অভিবাদন গ্রহণ করেন। এ সময় "বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক" "সোভিয়েত ইউনিয়ন দীর্ঘজীবি হোক" "মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক", এসব শ্লোগানে চারদিকমুখরিত হয়ে ওঠে। মিছিল শেষ হলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ফিরে আসি। এ দিনটি ছিল ছুটির দিন। হামিদ ভাই আমাদের বললেন, চল, আজ তোমাদের নতুন এক জায়গায় নিয়ে যাব, তোমাদের ভাল লাগবে। হামিদ ভাই ছিলেন আমাদের সব বিষয়ের ট্রাবল শুটার। এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। আমরা ইনস্টিউট প্রাঙ্গন থেকে

বের হয়ে হাঁটতে থাকি। কিছুদূর এগিয়ে গেলে সেভেরনায়া রাস্তার মোড়ে বাস স্টপটির পাশে খোলা আকাশের নিচে বিয়ারের (পিভা) দোকান। এগুলোর জনপ্রিয় নাম "পিভনুশকা"। সাজিয়ে রাখা কাঠের বোচকার ভেতর থেকে ঠান্ডা বিয়ার বড় বড় কাঁচের মগে ঢেলে বিক্রী করা হত; সঙ্গে থাকত রুশ ঐতিহ্যবাহী "সালেওনায়া রিবা (লবন দেয়া আধাশুকনো মাছ)"। বিয়ারের ফেনিল গ্লাসটিতে প্রথম চুমুক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভীষণ তিতা হয়ে গেল। খুবই বিরক্ত হয়ে বললাম, "হামিদ ভাই, আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছেন?" হামিদ ভাই তার স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বললেন, "আরে খাও খাও, কদিন পর আমাকে ফেলে একাই চুপি চুপি আসবে।" বলা বাহুল্য হামিদ ভাইয়ের এই ভবিষ্যৎ বাণী শত পার্সেন্ট সত্য প্রমানিত হয়েছিল। নিচের ছবিতে সেই বাস স্টপটিকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসেম্বর মাস শুরু হলে আমাদের প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষার তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। টিচাররা মাঝে মাঝে কুইজ পরীক্ষা নিতেন। এ সময় আমাদের অনর্গল রুশ ভাষায় কথা বলতে ও লিখতে অসুবিধা হত না। পাশ্চাত্যের মত সোভিয়েত ইউনিয়নে বড় দিনের কোন ছুটি ছিল না। নববর্ষকে সামনে রেখে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দুসপ্তাহের ছুটি হত। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ক্রাসনদার সিটি কাউন্সিল (নগর কর্তৃপক্ষ) শহরের সব উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তুতিপর্বে অধ্যয়ন বিদেশী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রুশ ভাষার ওপর "Я бы Русский выучил только за то, что им разговаривал Ленин (আমি রুশ ভাষা শুধু এ জন্যে হলেও শিখতাম যে, এতে লেনিন কথা বলেছেন " এই শিরোনামে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। আমি এতে প্রথম স্থান অধিকার করি। পুরস্কার হিসেবে শীতের ছুটিতে সরকারী খরচে এক সপ্তাহ রাজধানী মস্কো শহর ঘুরে বেড়াবার সুযোগ লাভ করি।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়, মস্কো ভ্রমন

নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ক্রাসনাদারে গাছের পাতাগুলো ঝরতে শুরু করে। পুরো ক্যাম্পাস ছেয়ে যায় বিভিন্ন রঙের বিবর্ণ পত্ররাজিতে। শীতের প্রতীক্ষায় গাছগুলো পত্রশূন্য হয়ে যায়। ডিসেম্বরের প্রথম দিক থেকে শীত জাঁকিয়ে বসে; ঠিক কখন প্রথম

তুষারপাত হয় মনে নেই। একদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠে জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখি, বার্চ গাছগুলোর ডালপালা ছেয়ে গেছে শুভ্র কোমল তুষারে। ক্লাসে যাবার সময় হয়ে এলে শীতের জামাকাপড় পড়ে বের হই এবং অতি সন্তর্পনে বরফের ওপর পা ফেলে হাঁটতে থাকি। সবসময় ভয় কখন না পা পিছলে পড়ে যাই। কোনরূপ দূর্ঘটনা ছাড়াই ইনস্টিউটে পৌঁছি এবং নিয়ম অনুযায়ী বেজমেন্টে গিয়ে শীতের ওভারকোট, ক্যাপ, মাফলার, হাতমোজা ইত্যাদি খুলে জমা দিয়ে ক্লাসরুমে এসে বসি। ক্লাস ছুটির পর বিকেলে হামিদ ভাই সুবাসদা ও ফাতেমা আপাকে সঙ্গে নিয়ে চার নম্বর ছাত্রাবাসে এলেন আমাদের দেখাতে কি ভাবে বরফের ওপর হাটতে হয়। আমরা সবাই বাইরে আসি। হামিদ ভাই আমাদেরকে দেখাতে গিয়ে নিজেই বরফের ওপর পড়ে গেলেন।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি প্রস্তুতি অনুষদের প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, সবাই পাস করে যাই। এটি ফাইনাল পরীক্ষা না হওয়ার কারণে ভয়ের কিছু ছিল না। পরীক্ষার পর দুসপ্তাহের শীতকালীন ছুটি (রুশ ভাষায় "কানিকুলি") শুরু হয়। ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের দেয়া ট্রেনের টিকেট ও আনুসঙ্গিক সুবিধাদি নিয়ে একদিন ট্রেনে চেপে আগের মত উল্টো যাত্রায় ক্রাসনাদার থেকে মস্কো রওনা হই। মস্কো পৌছালে আমাদর থাকার ব্যবস্থা করা হয় কোন একটি ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবাসে। মস্কোর পাতাল মেট্রোরেল (মেত্রোপলিতেন) দিয়ে শুরু হয় আমাদের মস্কো অভিজ্ঞতা। মস্কোতে তীব্র শীত ও রাস্তার দুধারে বরফের স্তুপ। রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে দেখা যায় বড় অক্ষরের "এম"-নিওন সাইন অংকিত স্থাপনা। গাইড বললেন, এটি পাতাল মেট্রোস্টেশনের উপরিভাগ, এখানে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হবে। আমরা স্টেশনে ঢুকলাম, ভাড়া মাত্র ৫ কোপেক (১০০ কোপেকে ১ রুবল), অর্থাৎ এক স্টেশনে ঢুকে মস্কোর যেখানেই যাই না কেন, ভাড়া একই, ৫ কোপেক। সিঁড়ি দিয়ে একটু নিচে নেমে গেলেই কনকোর্স, যেখানে গেট দিয়ে আটকানো প্রবেশমুখ। পাঁচ কোপেকের একটি কয়েন বক্সে ফেলতেই গেটটি খুলে যায়। সামনে চলন্ত সিঁড়ি (এসকেলেটর), গাইড অবলীলাক্রমে ওঠে গেলেন। আমি একটু ইতস্তত করছিলাম, তারপর চলমান সিড়িঁর যে স্টেপটি সামনে এল তার ওপর ঝাঁপ দিয়ে ওঠে পাশের হ্যান্ডেলটি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরি। নিচের দিকে তাকিয়ে থাকি, সিঁড়ি নিচে নামছে ত নামছেই। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অনেক যাত্রী নিবিষ্ট চিত্তে বই পড়ছেন। একটু পরেই প্লাটফরমের দেখা মেলে, চলন্ত সিঁড়িটি সমতলের সংগে লেভেল হওয়ার আগেই ওপর থেকে লাফ দিয়ে ধপ করে নিচে নেমে পড়ি।

প্লাটফর্ম ত নয় যেন রাজপ্রাসাদ, দেয়ালগুলো কারুকাজ করা সুদৃশ্য মার্বেল পাথরে ঢাকা; সিলিং থেকে ঝুলছে ঝাড়বাতি, চারদিকে আলোর বন্যা, ধূলোবালির লেশমাত্র নেই। মস্কো পাতাল রেলের স্থাপত্যকলা ও নান্দনিক সৌন্দর্য প্রবাদতুল্য ছিল। এটির এখনো কোন হেরফের হয় নি। এরই মধ্যে হুড়হুড় করে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়ে; বগিগুলো ঘন নীল রং-এর, মাঝখানে হলুদ রং-এর ব্যান্ড। দরজা আপনা-আপনি খুলে যায়, যাত্রীরা নামতে থাকে। গাইড আগে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এক মিনিটের বেশি থামে না। তাই ট্রেনটি যেন আমাকে ছেড়ে না চলে যায়, সেই ভয়ে ও উত্তেজনায় টানটান হয়ে একটি বগির দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। যাত্রীদের নেমে যাওয়া শেষ হওয়ার আগেই পাশের ফোঁকড়ে মাথা গলিয়ে দিলাম ভিতরে ডাইভ। এ রকম অদ্ভুতভাবে ঢুকতে দেখে ভিতরে বসা যাত্রীরা আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, কেউ কেউ মুচকি হাসলেন। আমি আড়ষ্ট হয়ে একটি খালি সিটে বসে পড়লাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ পর আরেকটি স্টেশনে এসে থামে; দরজা খুলে যায়, যাত্রীরা নামা ওঠা করে, তারপর দরজা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় ইন্টারকমে সুরেলা কন্ঠে বেজে ওঠে রেকর্ডকৃত সতর্কীবাণী “তাভারিশ্যি, আস্তারোঝনা, দিভিয়েরি জাক্রিভাইয়ুৎসা, স্লেদউয়ুশ্যায়া স্তান্ৎসিয়া লেনিনস্কিয়ে গোরি অর্থাৎ বন্ধুরা, সাবধান, দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পরবর্তী স্টেশন লেনিন পাহাড়”।

ঠিক কোন মেট্রো স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল মনে নেই, তবে যেটিতে নামলাম, সেটি খুব সম্ভবত ছিল মেট্রোর বৃত্তাকার লাইনের (কলৎসেভায়া লিনিয়া) ওপর অবস্থিত বড় জংশন গোর্কি পার্ক স্টেশন (পার্ক কুলতুরি ইমেনি গোরকাভা)। এখানে নেমে ট্রেন বদলে অন্য লাইনের ট্রেনে ওঠি। যে স্টেশনটিতে এসে নামি, তার নাম "মার্কস স্ট্রিট (প্রসপেক্ত মার্কসা)"। এবার স্বাচ্ছন্দে এসকেলেটরে চড়ে গহীন পাতাল থেকে ওপরে উঠে আসি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মস্কো মেট্রোর অধিকাংশ স্টেশন ইউরোপ-আমেরিকার তুলনায় ভূপৃষ্ট থেকে অনেক গভীরে অবস্থিত। "মার্কস স্ট্রিট”স্টেশনের খুব কাছাকাছি অন্য লাইনের ওপর অবস্থিত আরো দুটো মেট্রো স্টেশন "রেভলিউশন স্কয়ার (প্লশ্যিদ রেভলিউৎসি)" ও "স্ভেরদলোভ স্কয়ার (প্লশ্যিদ স্ভেরদলোভা"। গাইড বললেন আমরা এখন মস্কোর কেন্দ্রবিন্দুতে (ৎসেন্তর মাস্কভি) দাড়িঁয়ে আছি। অদূরেই প্রখ্যাত "রেড স্কোয়ার (ক্রাসনায়া প্লশ্যিদ)", আক্ষরিক অনুবাদ "সুন্দর চত্বর", পুরোনো রুশ ভাষায় "ক্রাসনি" শব্দটি "সুন্দর বোঝাতে ব্যবহৃত হত। রেড স্কোয়ার রুশ সাম্রাজ্য-সোভিয়েত ইউনিয়নের দীর্ঘ ইতিহাসের বহু ঘটনার সাক্ষী। কালো পাথরে বিছানো ও চারপাশে স্থাপত্যকলার উৎকৃষ্ট

নিদর্শন বেষ্টিত এ খোলা ময়দানটি যে কোন বিদেশী আগন্তুকের মনে জাগাবে রুশ রাষ্ট্রের উদ্ভব ও এর সংস্কৃতির বিবর্তন সম্পর্কে ব্যাপক কৌতুহল।।

সাধারণ মানুষ যেমন এ ময়দানে ঘুরে বেড়ায় ও মস্কোর নান্দনিক শোভা উপভোগ করে, তেমনি এখানে সংগঠিত হয় জাতীয় জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী। এ ময়দানটি সোভিয়েত-রুশ জনগণের আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক। প্রতি বছর রেড স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হয় মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বার্ষিকী ও বিজয় দিবসের বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সামরিক কুচকাওয়াজ ও শোভাযাত্রা। পহেলা মে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রা। আমরা রেড স্কোয়ারে হাঁটতে থাকি। স্কোয়ারটির গা ঘেঁষেই সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ক্রেমলিন (ক্রেমল), সোভিয়েত সরকারের সর্বোচ্চ পীঠ। ক্রেমলিন প্যালেস অব কংগ্রেসেস ছিল বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুবিদিত নাম, এখানে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রস অনুষ্ঠিত হত, যেখানে অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা আমন্ত্রিত হতেন। রেড স্কোয়ারের পশ্চিম পাশে লেনিনের সমাধি, লেনিন মুসোলিয়াম (মাভজালেই লেনিনা), এখানে লেনিনের মরদেহ মমি করে সংরক্ষিত করা হয়েছে। মুসোলিয়ামের সামনে চব্বিশ ঘন্টা পাহারারত মূর্তির মত সটান হয়ে দাঁড়িয়ে গার্ড অব অনার (পাচ্চোতনি কারাউল)। মুসোলিয়ামের ওপর দাঁড়িয়ে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ সামরিক কুচকাওয়াজ ও জনতার অভিবাদন গ্রহণ করতেন। এরপর আমরা গেলাম অপর পাশে স্পাসকি টাওয়ার ও ইতিহাস যাদুঘরে। এরপর গাইড নিয়ে গেলেন রেড স্কোয়ারের কাছাকাছি তৎকালীন মস্কোর সবচেয়ে বড় বিপণীবিতান "স্টেট ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে (গুম)"।

গাইড বললেন মুসোলিয়ামে ঢোকা আজ আর সম্ভব নয়। কাল ভোরে তোমাদের নিয়ে আসব। পরদিন খুব সকালে রেড স্কোয়ারে এসে মুসোলিয়ামের সামনে অপেক্ষমান জনতার লাইনে আমরা দাড়াঁই। এটি সোভিয়েত জনগণের কাছে তীর্থস্থানের তুল্য ছিল। বিশাল দেশটির নানা প্রান্ত থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ লেনিনকে দেখতে ভিড় জমাতেন। খুব সম্ভব সকাল দশটার দিকে দর্শনার্থীদের জন্য মুসোলিয়াম খুলল; আমরা ধীরে ধীরে এগুতে থাকি। এক সময় চলে আসে আমাদের ভিতরে ঢোকার পালা। ভিতরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে একটু নিচে নামলেই একটি হলঘর, যেখানে কাঁচের আবরণের ভিতর চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন মানব

ইতিহাসের অন্যতম মহানায়ক ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কাউকে দাঁড়াতে দেয়া হয় না। আমরা এক দিক থেকে ঢুকে এক মিনিটের মত প্রদক্ষিণ করে অন্য দিক দিয়ে বের হয়ে যাই।

আমাদের মস্কো দর্শনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় তীব্র শীত ও হিমেল বাতাস। তাপমাত্রা শূন্যের বিশ-পঁচিশ ডিগ্রী নিচে। এত শীতে আমরা তখনো অভ্যস্ত হই নি। তবু আমাদের আগ্রহের কমতি ছিল না। পরের দিন আমাদের মূল গন্তব্য ছিল Exhibition of achievements of the national economy (রুশ ভাষায় "ভিস্তাভকা দাস্তিঝেনী নারোদনাভা খাজইয়াস্তভা" সংক্ষেপে "ВДНХ ভেদেএনখা")। আমরা মেট্রোতে চড়ে রওনা হলাম, তৎকালীন কালুঝস্কো-রিঝস্কায়া লাইনের শেষ প্রান্তের স্টেশন ভেদেএনখা-তে নেমে রাস্তা পেরিয়ে কিছুদূর হেঁটে গেলে একজিবশন সেন্টারের মূল প্রবেশদ্বার। যদিও দেখার অনেক কিছুই ছিল, আমাদের মূল আকর্ষণ ছিল "কসমস (মহাশূন্য)" প্যাভিলিয়ন। এখানে সোভিয়েত মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তাৎপর্যপূর্ণ ল্যান্ডমার্কগুলোর রেপ্লিকা সংরক্ষিত ছিল। আমরা প্রথম ওই প্যাভিলিয়নে ঢুকে দেখলাম প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ "স্ফুতনিক"-এর রেপ্লিকা। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল প্রথম নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন "ভাস্তোক" নামের যে যানটিতে চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন, সেটি ও সেখানে ছিল। কসমস প্যাভিলিয়নে অন্যান্য নভোযানগুলোরও রেপ্লিকা সংরক্ষিত ছিল। একজিবিশন সেন্টার দেখার পর বাকী দিনগুলোয় গাইড আমাদের আরো অনেক জায়গায় নিয়ে যান। এর মধ্যে যেগুলো মনে পড়ছে, তা হল লেনিন পাহাড়ের ওপর অবস্থিত মস্কো লমোনোসভ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও নিকটবর্তী মাস্কভা (রুশ ভাষায় মস্কো শহরের নাম) নদীর পাড়ে লুঝনিকি স্টেডিয়াম (যেখানে গত বছর ফুটবল অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়); বিশ্বখ্যাত ত্রেতইয়াকভ আর্ট গ্যালারী, কেন্দ্রীয় লেনিন লাইব্রেরী, বলশয় থিয়েটার (বালশোই তিয়াতর) ও বেশ কয়েকটি যাদুঘর। মস্কো ভ্রমনটি ছিল ফিল্ড প্র্যাকটিসের মত, তিন মাস বই থেকে যা কিছু শিখেছিলাম, তার অনেক কিছুই স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হল। জ্ঞানে বুদ্ধিতে আরো কিছুটা সমৃদ্ধ হয়ে নববর্ষের প্রাক্কালে ক্রাসনাদার ফিরে আসি।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়: সমাপ্তির পথে প্রস্তুতি পর্ব

ছুটি শেষ হয়ে যাবার পর আবার পুরোদমে শুরু হয়ে যায় ক্লাশ। ক্রাসনাদারে ও নেমে আসে পুরোদস্তুর শীত, শুরু হয় ভারী তুষারপাত। ততদিনে ক্রাসনাদারে সোভিয়েত সমাজে নিমজ্জিত হওয়ার প্রাথমিক ধাপ শেষ করে নিজস্ব ধারায় আমাদের রমরমা সমাজ জীবন গড়ে ওঠেছে। ক্রাসনাদারের অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহেও বাংলাদেশের ছাত্ররা পড়াশুনা করত। তখন এদের প্রায় সবাই আমাদের সিনিয়র ছিলেন। নাসির ভাই ও মইনুর রশীদ ভাই পড়তেন ক্রাসনাদার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে (ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি), শহীদ ভাই, সাঈদ ভাই পড়তেন ক্রাসনাদার মেডিকেল ইনস্টিউটে, মহিবুর রহমান মানিক ভাই ও তসলিম ভাই পড়তেন কুবান রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। অসীমদা ও হাবিব ভাইয়ের মাধ্যমে এদের সবার সংগে আমাদের সখ্যতা গড়ে ওঠে। যেহেতু কুবান কৃষি ইনস্টিউটে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশের ছাত্র পড়াশুনা করত, তাই আমাদের ছাত্র সংগঠনের মূল কার্যক্রম এখান থেকে পরিচালিত হত। আমরা আসার পর নতুন টগবগে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে সংগঠনটির কার্যক্রম আরো দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ১৯৭৭ সালের ২৬ শে মার্চ আমরা স্তালেভায়াতে (ক্যান্টিন) আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ষষ্ট বার্ষিকী উদযাপন করি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নেয়া নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি সোভিয়েত জনগণের ব্যাপক সহমর্মিতা ও সহানুভূতি ছিল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিউটের রেক্টর (ভাইস চ্যান্সেলর) ইভান তিমাফেয়েভিচ ক্রবিলিন, বৈদেশিক সম্পর্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-রেক্টর গিওর্গি সের্গেইয়েভ, ট্রপিক্যাল ও সাবট্রপিক্যাল এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টির ডিন নিকোলাই সিমিয়োনোভিচ কতলেয়ারভ সহ আমাদের শিক্ষক সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অসীমদা-হাবিব ভাই-আনসার ভাই-পরমেশদা-হামিদ ভাইদের সার্বিক তত্বাবধানে একটি বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নবাগতদের ভেতর দারুন রিসোর্স পারসন ছিল। তখনকার দিনে কমপিউটার বা ওয়েব-বেজড প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূয়া ব্যক্তিদের শিল্পী সাজার কোন সুযোগ ছিল না। শিল্পী মানেই সহজাত প্রতিভা, রং আর তুলির আঁচড় ব্যবহার করে মূর্ত করে তোলা ভাবনা ও জীবনবোধ। খলিল খুব সুন্দর করে আঁকলো কয়েকটি চিত্র, বানালো সুদৃশ্য ব্যানার ও আর্কষণীয় করে স্তালোভায়ার নিচ তলার খোলা জায়গাটি সাজালো উৎসবের উপযোগী করে। আবুল তাকে করল সহযোগিতা ও রুশ-বাংলা মিশিয়ে তৈরি করল সুন্দর ধারা বিবরণী। আমাদের গ্রুপে অধ্যয়নরত শ্রীলংকার দুই বন্ধু - লক্ষণ আবেকুন ও জওথুফের (জাফর বলে ডাকতাম) - ওরাও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে আমাদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে। জাফর বাজাতো ব্যান্ড। মানসদা,

সুবাসদা, পরমেশদা, হামিদ ভাই এরা সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। মানসদা গাইলেন "অলির কথা শুনে বকুল হাসে.."। আমাদের অনুষ্ঠানটি খুবই জমকালো হয়েছিল।

মার্চের মাঝামাঝি থেকে ক্রাসনাদারের প্রকৃতির রং বদলে যেতে শুরু করে, শীতের অবসান ঘটতে থাকে, গাছের ডালপালাগুলোতে বইতে শুরু করে সঞ্জীবনি রস, শীতে ঘুমিয়ে থাকা কুঁড়িগুলো ফুটতে শুরু করে, মাটি থেকে ভেসে আসে বসন্তের ঘ্রাণ ও বুনোফুলের গন্ধ। সেপ্টেম্বরে আসার পর আমরা দেখেছি শরতের পাতা ঝরা আর মার্চে বসন্তের আগমনে নগ্ন প্রকৃতি হঠাৎ করে সবুজ পত্রপল্লবে ছেয়ে যায় I বসন্তের আগমনে মানুষ হয়ে ওঠে আনন্দে মাতোয়ারা। বিখ্যাত রুশ কবি সের্গেই ইয়েসেনিন তাঁর "বসন্তের সন্ধ্যা" কবিতায় লিখেছেন:

Весенний вечер
Тихо струится река серебристая,
В царстве вечернем зеленой весны.
Солнце садится за горы лесистые,
Рог золотой выплывает луны.
Запад подернулся лентою розовой,
Пахарь вернулся в избушку с полей,
И за дорогою в чаще березовой
Песню любви затянул соловей.
Слушает ласково песни глубокие
С запада розовой лентой заря.
С нежностью смотрит на звезды далекие
И улыбается небу земля.

নীরবে বয়ে যায় রুপালী নদী
গোধুলির সবুজ বসন্তের রাজত্বে
ডুবে যায় সূর্য্য বনপাহাড়ের আড়ালে
ভাসতে থাকে সোনালী চাঁদের শিং
গোলাপী আভার চাদরে ঢেকে যায় পশ্চিম।
মাঠ থেকে আসে ফিরে কিষাণ কুটিরে তার
বার্চ গাছের আড়ালে ঢেকে যাওয়া রাস্তা পেড়িয়ে
পাপিয়ার কন্ঠে বাজে ভালবাসার গান
সস্নেহে শুনে সেই গান
পশ্চিম থেকে গোলাপী আভায় রাঙিয়ে হয় ভোর;
আদরের পরশে তাকিয়ে দেখে দূরের তারা;
আকাশের পানে তাকিয়ে হয় উৎফুল্ল বিশ্বচরাচর।

প্রকৃতিপ্রেমী রুশ কবিরা যে ভাবে বসন্তের আগমন উপলব্ধি করেছেন, বসন্ত সে ভাবেই ধরা দেয় ক্রাসনাদারে। ক্লাস শেষ হয়ে যাবার পর বাকী সময়টুকুর বড় অংশ কাটতো বাইরে ঘুরে। বাইরে কোথায় কি করা যায়, এ সব বিষয়ে ইনোভেটিভ আইডিয়া আসত বড়মিয়া এবং তাহেরের কাছ থেকে। তখনকার দিনে স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, ও সামাজিক মিডিয়ার জাল মিলে বিশ্বকে ঘরে বসেই এখন হাতের মুঠোয় পাওয়ার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা ছিল না। কোন কিছু জানতে হলে প্রাইমারী সোর্সের সরাসরি সংস্পর্শে আসার বিকল্প ছিল না। তাই আমরা সব সময় থাকতাম "ইন্নোসেন্টলি ইগনোরেন্ট (নির্দোষভাবে অজ্ঞ)" হয়ে। এতে সুবিধা ছিল এই ছোটখাট নতুন জিনিস দেখেই কৌতুহল বোধ করতাম, ভাল লাগতো। শহরের রাস্তাঘাট ও দোকানপাট পরিচিত হয়ে ওঠে। বড় বড় দোকান ও বিপণিবিতানগুলো ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানায়। ফাস্ট ফুডের কোন চেইন স্টোর ছিল না। এর পরিবর্তে ছিল বুফেত, যেখানে পাওয়া যেত হালকা খাবার ও ড্রিংকস। এগুলো ও ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানায়। রাস্তার ধারে

ব্যক্তিমালিকানায় ও ছোট ছোট দোকান বসত, আমরা সেগুলো থেকে আইসক্রিম (মারোঝেনায়ে) কিনে খেতাম। প্রথম দিন কোণ ভর্তি আইসক্রিম খেয়ে কাগজের কোণটি ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছি তখন এক বড় ভাই যিনি সংগে ছিলেন, না না করে হেসে ওঠে বললেন "ফেল না, এটি ও খাওয়া যায়।"
গ্রোসারীর বড় বড় দোকানগুলো (গাস্ত্রোনম) ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানায়, কিন্তু কাঁচা বাজার ও মাছ, মাংস, ডিম বিক্রির জন্য পাশাপাশি ছিল কৃষি মার্কেট (কালখোজনি রিনক) ও কো-অপারেটিভ মার্কেট (কো-অপেরাতিভনি রিনক)। এ সব মার্কেটে নির্ধারিত ছোট ছোট স্টলে বসে যৌথ খামারীরা তাদের বাড়ীর আংগিনার প্লটে (প্রিদভরনায়া উসাদবা) উৎপাদিত শাকসব্জি, ফলমূল, হাঁস-মুরগী, ডিম, মাছ ও কুটির শিল্পে তৈরি করা নানাবিধ প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য বাজারমূল্যে বিক্রি করতেন। দোকানদার ছিলেন মূলতঃ বাবুশকা-রা, তাদের সাথে দরদাম করে মুরগির মাংস (কুরিৎসা),শাক-সব্জি এ সব কিনতাম। উল্টাপাল্টা দাম বললে তারাও দু কথা শুনিয়ে দিতেন। দামে বেশী হলেও এগুলোর গুণগত সরকারী দোকানগুলোর চেয়ে উন্নত ছিল। ক্রাসনাদারের মূল রাস্তাটির নাম ক্রাসনায়া উলিৎসা। শহরের ল্যান্ডমার্কগুলোর মধ্যে ছিল শিখা অনির্বান (ভেচনি আগোন), ড্রাম থিয়েটার, আভরোরা (অরোরা) সিনেমা হল, পুশকিন লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, ইত্যাদি।

শিখা অনির্বান (ভেচনি আগোন), মাতৃভূমি রক্ষার্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের স্মৃতি স্মরণে ২৪-ঘন্টার প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখা, পাশে মাথা উচুঁ করে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে দুজন সস্ত্র প্রহরী। জাতীয় উৎসবের দিনগুলোতে বেদীমূলটি পুষ্পস্তবকে ভরে যায়। নবদম্পতিরা এখানে অর্পণ করেন পুষ্পস্তবক। শহরের আরেকটি বড় ল্যান্ডমার্ক বইঘর (দোম ক্নিগি), এখানে আমরা আসতাম ভিউ কার্ড ও বই কেনার জন্য। বই কেনা নেশা ছিল। কৃষিবিজ্ঞানের ওপর যে কোন বিদেশী বই রুশ ভাষায় অনূদিত হলে সাগ্রহে কিনতাম। চলমান পড়াশুনার চাপে এ সব গ্রন্থের অধিকাংশই নেড়ে চেড়ে পরে কোন এক সময় ভাল করে পড়ব বলে শেলফে রেখে দিয়েছি। কিন্তু সে সময় কখনো আসে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ নম্বর ছাত্রাবাস থেকে বেরিয়ে সীমানা প্রাচীরের গেটটি অতিক্রম করে মেঠোপথ ধরে কিছুদূর হেঁটে গেলে কুবান নদী। আমাদের সময় নদীর তীর বরাবর "নাবেরেঝনায়া"-ধরনের (সুদৃশ্য শান বাঁধানো তীর ঘেঁষে হেটেঁ বেড়ানোর রাস্তা) কিছু ছিল না। একেবারে বুনো প্রকৃতি। এখানে বিকেল বেলায় ঘুরে বেড়াতাম; অনেকে আসতেন মাছ ধরার জন্য। একবার কোন একদিন ছুটির দিনে সুবাসদা ও হামিদ ভাই কুবান নদী থেকে অনেকগুলো কার্প মাছ ধরে আমাদের জন্য চার নম্বর ছাত্রাবাসে নিয়ে এলেন। সবাই মিলে মজা করে খেলাম।

এভাবে মে মাস এসে যায়। মে সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎসবের মাস। ১লা মে উদযাপিত হত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। সত্তুর দশকের প্রথম ভাগ, লিওনিদ ব্রেঝনেভের শাসনামল, সোভিয়েত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সূর্য্য তখন মধ্যগগনে। এ সময় মার্কিন চক্রান্ত নস্যাৎ করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, দীর্ঘদিন রক্তক্ষয়ী দখলদারি যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে মার্কিন বাহিনীর পরাজয়ের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম রাষ্ট্রের উদ্ভব, এ সব কিছু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তৃতির সুযোগ এনে দেয়। এর প্রতিফলন দেখা যেত পহেলা মে উদযাপনে। মস্কোর রেড স্কোয়ারে পহেলা মে অনুষ্ঠিত হত শ্রমজীবি জনতার বিশাল সমবেশ, যেখানে আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থি শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবর্গ। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ লেনিন মুসোলিয়ামের ওপর দাঁড়িয়ে জনতার অভিবাদন গ্রহণ করতেন। এই ঐতিহ্যের সংগে তাল মিলিয়ে সারা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে পহেলা মে ক্রাসনাদারেও অনুষ্ঠিত হয় শ্রমিক-জনতার মিছিল। আমরা ও উৎফুল্ল জনতার সঙ্গে মিশে মিছিলে অংশ গ্রহণ করি। এরপর আসে ৮ই মে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অর্জিত বিজয় দিবস (দেন পাবেদি), সোভিয়েত জনগণের কাছে এ যুদ্ধের নাম ছিল "পিতৃভূমি রক্ষার্থে মহান যুদ্ধ (ভেলিকায়া আতেচেস্তভেন্নায়া ভায়না)। এ যুদ্ধে ফ্যাসিবাদী জার্মানীর পরাজয়ে সোভিয়েত জনগণের ছিল বিশাল আত্মত্যাগ। প্রায় দুই কোটির অধিক সোভিয়েত মানুষ এ যুদ্ধে আত্মাহুতি দেন। স্তালিনগ্রাদ, কুর্স্ক, এ সব যুদ্ধের মাঠে রেড আর্মির বিজয় নাৎসী বাহিনীর পরাজয়ের ধারা সূচনা করে ও অধিকৃত সোভিয়েত ভূখন্ড দ্রুত মুক্ত হতে থাকে। ১৯৪৫ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বার্লিন দখল করে ও ৮ই মে ফ্যাসিবাদী জার্মানী আত্মসমর্পন করে। বিজয় দিবসে মস্কোর রেড স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হত সামরিক কুচকাওয়াজ ও জনগণের বিজয় মিছিল। ক্রাসনাদারে অনুষ্ঠিত হয় বিজয় দিবসের মিছিল ও শোভাযাত্রা; আমরাও অংশগ্রহণ করি।

প্রকৃতির রূপ বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাপ্তির দিকে চলে আসে প্রস্তুতি পর্বের ক্লাশগুলো। পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে এবং বাড়তে থাকে মানসিক চাপ। কারণ কোন বিষয়ে ফেল করলে পুনরাবৃত্তির সুযোগ ছিল না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে টেকনিকুমে পাঠানোর ভয় ছিল। জুলাই মাসের প্রথম দিকে পরীক্ষা শুরু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পরীক্ষা পদ্ধতিতে মেধা যাচাই করা হত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সমন্বয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষার হলে পরীক্ষকের সামনে একটি বড় টেবিলে উল্টো করে

বিছানো থাকত টিকেটের (বিলেত) আকারে প্রশ্নপত্র। এ সব প্রশ্নপত্রে থাকত তিন-চারটি করে প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের বলা হত যে কোন একটি বেছে নিতে। বেছে নেওয়া টিকেটটি উল্টে প্রিন্ট করা প্রশ্নগুলো দেখে যদি কেউর পছন্দ না হত এবং দ্বিতীয়বার চান্স নিতে চাইত, তাহলে শুরুতেই সে একটি গ্রেড হারাত। বড় ভাইরা আমাদেরকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। উত্তর মূল্যায়নের জন্য ছিল ৫-পয়েন্টের গ্রেড সিস্টেম। পাঁচের মধ্যে পাঁচ পেলে, সে গ্রেডটি হত "এক্সেলেন্ট (আতলিচনা)", চার পেলে হত "গুড (খারাশো)", তিন পেলে সন্তোষজনক (উদাভলেতভরিতেলনা) এবং "দুই (দভয়ইকা)" পেলে ফেল। প্রশ্নপত্রটি বেছে নেয়ার পর আধ ঘন্টা সময় দেয়া হত উত্তরপত্রের ওপর সম্ভাব্য উত্তরগুলো লিখে পরীক্ষকের সামনে মৌখিকভাবে উপস্থাপন করা। পরীক্ষক এ সব প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে আরো প্রশ্ন করতেন, অন্যথায় নম্বর বসিয়ে দিতেন।
পরীক্ষা শুরু হল রুশ ভাষা দিয়ে। পরীক্ষার হলে ঢুকে দেখি অন্য গ্রুপের টিচার নিনা আউরোনোভনা বসে আছেন সামনে রাখা টেবিলে প্রশ্নপত্রগুলো বিছিয়ে। দৈবচয়নের মাধ্যমে একটি টিকেট তুলে নেই এবং নির্ধারিত সিটে বসে প্রশ্নগুলো দেখি। খুব একটা কঠিন মনে হল না, উত্তরগুলো জানাই ছিল। প্রস্তুত হতে খুব বেশি সময় লাগল না, হাত তুললে টিচার যেতে বললেন। নির্ধারিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া শেষ হলে আর কোন প্রশ্ন না করে নম্বর বসিয়ে হাসিমুখে বললেন "পাজদ্রাভলেয়ায়ু (কনগ্রাচুলেশন)"। পরীক্ষা নিয়ে সব ভয়ভীতি কেটে গেল, বাইরে এসে বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। কিছুক্ষণ পর ওরাও বেরিয়ে আসে। সবাই আমরা আশাতীত ভাল নম্বর পেয়ে রুশ ভাষা পরীক্ষা উতরে গেলাম। সবারই কনফিডেন্স ফিরে এসেছে। এ ভাবে বাকি বিষয়গুলোর ওপর ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। টেকনিকুমে যাওয়া ত দূরের কথা, আমরা বাংলাদেশের সব ছাত্রই রেকর্ড সৃষ্টি করে প্রস্তুতি পর্বের গন্ডি পার হয়ে গেলাম।

এ সময়ের অনুভূতি ছিল দারুন। স্বপ্ন দেখার শেষ ছিল না। সমকালীন সময়ে বিদেশী ছাত্ররা যারা পাশ্চাত্যে পড়াশুনা করত, তাদের বড় সময় কাটত সংগ্রামে, পার্ট টাইম চাকরি করে উপার্জনের অর্থ দিয়ে টিউশন ফি জোগার করতে হত; তাদের অবস্থান থাকতো সে সব সমাজের প্রান্তসীমায়। পক্ষান্তরে আমাদের এ সব কোন কিছুই নিয়ে চিন্তা করতে হত না। আমরা যাতে পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজের মূলধারায় মিশে যেতে পারি, তার জন্য কর্তৃপক্ষ সব চেষ্টা করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অবিসংবাদিত নেতা ইওসিফ স্তালিনের নেতৃত্বে বিধ্বস্ত অর্থনীতি পূনর্গঠনের কাজ শেষ করে সোভিয়েত অর্থনীতিতে যোগ হয় উল্লম্ফনের ধারা; ষাটের দশকের শুরুতে মহাকাশ বিজয়ের সাফল্য সোভিয়েত সমাজে সঞ্চারিত করে অভাবিত অনুপ্রেরণা । সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কেউই সন্দিহান ছিল না। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে জাতীয় আয়ের বরাদ্দের বিচারে সব দেশকে ছাড়িয়ে যায়। সামাজিক খাতে দেশটির সাফল্যের কোন তুলনা ছিল না। চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার বয়সসীমা বিশ্বে সর্বনিম্ন ছিল - নারীদের বেলায় ৫৫ বছর, পুরুষের বেলায় ৬০ বছর। সর্বস্তরে সবার জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা, বিনামূল্যে সার্বজনীন চিকিৎসা সেবা, আবাসনের জন্য নামমাত্র ভাড়ায় বরাদ্দ এপার্টমেন্ট ভবন ও জনকল্যাণের জন্য গৃহায়ন খাতে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগ, নামমাত্র গণপরিবহন ভাড়া (পাঁচ পয়সায় পাতাল রেলের যে কোন গন্তব্যে ভ্রমন; বাস, ট্রাম সহ ভূ-উপরিস্থ যানবাহনে যে কোন গন্তব্যে চার পয়সা ভাড়া); খাদ্যদ্রব্যের স্থিতিশীল নিম্নমূল্য । সোভিয়েত জনগণের কাছে অপরিচিত ছিল বেকারত্ব, গৃহহীন হয়ে রাস্তায় জীবনযাপন, কিংবা শিক্ষার আলো না দেখা, ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের দূঃশ্চিন্তা ছিল না। আগামী দিনের প্রতি আস্থা (উভেরেন্নস্ত ভ জাফত্রাশনেম দ্নে) ছিল সোভিয়েত সমাজের চোখে পড়ার মত বৈশিষ্ট্য, যা আমরা ও অনুভব করেছি।

পরীক্ষার পর ছুটি হয়ে গেল। প্রায় দেড় মাসের মত অবকাশ। সিনিয়র বড়ভাইদের অনেকে বাড়তি রোজগার করার জন্য যেতেন কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডে কাজ করতে । কিন্তু এটি ছিলঅত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও দূর্বলদের পক্ষে টিকে থাকা মুশকিল হত। আমরা বেছে নিলাম ভ্রমন। কৃষ্ণ সাগরের পাড়ে ছিল আমাদের ইনস্টিউটের নিজস্ব স্পোর্টস ও হেলথ সেন্টার "ক্রিনিৎসা"। ইনস্টিউটের দেয়া বাসে চড়ে একদিন আমরা রওনা হলাম "ক্রিনিৎসা" সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশ্যে। আমাদের প্রায় সবার জন্য এটি ছিল প্রথমবার সমুদ্রসৈকত দেখা। সুইমিং প্যান্ট পড়ে সাগরে সাঁতার কাটা, ঢেউয়ের সংগে বালুচড়ে আছড়ে পড়া, তীরে স্বল্প বসনে আবৃত মানুষের ভিড়ে বসে রোদ পোহানো বা তীরে বসে ঢেউ গোনা, এ সব করে ক্রিনিৎসার সমুদ্র সৈকতে কেটে যায় দুসপ্তাহ।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়: প্রথম গ্রীষ্মের ছুটি ও সাগর সৈকতে ভ্রমন

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে আসে। সমুদ্র স্নান ও সূর্য্য স্নানে উজ্জীবিত হয়ে ক্রিনিৎসার সমুদ্র সৈকত থেকে আমরা ক্রাসনাদার ফিরে আসি।ইন্সটিউট থেকে জানানো হয় পরবর্তী পড়াশোনার জন্য আমাদের সবাই ক্রাসনাদারে থাকছে না। আমাদের দলটি ছোট হয়ে যাবে, এই ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল। জহির ও শাহজাহানকে যেতে হবে মধ্য এশিয়ার উজবেক প্রজাতন্ত্রের তাশখন্দে; আর

রহমান যাবে বেলারুশ প্রজাতন্ত্রের মিনস্কে। ক্রাসনাদারে থাকলাম আমি,খলিল, আবুল, তাহের ও হারুন। আমাদেরকে চার নম্বর ছাত্রাবাস ছেড়ে দিতে হল, আমরা উঠলাম বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত দশ নম্বর ছাত্রাবাসে, ৪১৮ নম্বর রুম দিয়ে শুরু হয় আমার, খলিল ও আবুলের একসংগে থাকা। অন্যদের মধ্যে হারুন খুব সম্ভবত মানসদার সংগে এক রুমে আর তাহের ও আনসার ভাই এক সঙ্গে অন্য আরেকটি রুমে থাকার ব্যবস্থা হয়। (নিচের ছবিতে দশ নম্বর ছাত্রাবাস দেখা যাচ্ছে।)

এবার সবাই একই হোস্টেলে থাকার কারণে বয়সের ব্যবধান ঘুচতে থাকে, ও সবার সংগে বন্ধুর মতই সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কথাবার্তায় কোন লাগাম থাকত না। তারপরে ও অভারঅল স্ট্রাটেজিক গাইডেন্সের জন্য নির্ভর করতাম অসীমদা ও হাবিব ভাইয়ের ওপর। এঁরা দুজন তখন তাদের মাস্টার্সের শেষ পর্যায়ে। আমাদের পড়াশোনা কোন ধারায় এগুবে, বিশেষত আমার ক্ষেত্রে, তার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে এঁদের দুজনের ভূমিকা অপরিসীম। হাবিব ভাই ছাত্রাবস্থার গোড়ার দিক থেকেই ছিলেন একনিষ্ঠ গবেষক,অনেকটা ভুলেভালা প্রকৃতির। ইনস্টিউটের ডেনড্রারিয়ামে ছিল ফিল্ড ল্যাবরেটরি এবং কাছাকাছি একটি গ্রীনহাউজ ও নেটহাউজ। হাবিব ভাই সেখানে প্লান্ট ফিজিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আল্লা ইয়াকভলেভনার সংগে গবেষণা করতেন। আমি তাকে প্রায়ই গবেষণার কাজে সহায়তা করতাম। এতে আমার ও ফিল্ড এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন সম্পর্কে আগে থেকেই কিছুটা ধারণা গড়ে ওঠে। অসীমদা ও হাবিব ভাইয়ের রুমে আমার অনেক সময় কেটেছে। তাঁদের তত্বাবধানেই আমার রেড ওয়াইনের প্রথম স্বাদ গ্রহণ। একদিন সন্ধ্যায় তাদের রুমে বসে টিভি দেখছি, তখন খুব সম্ভবত চলছিল টেলিফিল্ম "কাপিতানস্কায়া দোচকা (ক্যাপ্টেনের মেয়ে) । হাবিব ভাই ফ্রিজ থেকে রেড ওয়াইনের একটি বোতল বের করে টেবিলে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর লম্বা ঝাকঁড়া চুলের ভেতর থেকে স্বভাবসুলভ মুচকি হাসি হাসলেন। এতবড় প্রশ্রয় ছেড়ে দেয়ার পাত্র আমি ছিলাম না। তারা যে ভাবে সোভিয়েত সমাজকে দেখতেন ও তৎকালীন বিশ্বের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করতেন তা অজান্তে আমাদের ভেতরে ও সঞ্চারিত হয়। আজকের ভাষায় তারা আমার রোলমডেল ছিলেন।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়: প্রথম বর্ষে পদার্পণ

বছর ঘুরে যায়। ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শুরু হয় প্রথম বর্ষের ক্লাশ, ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে বিষয়-ভিত্তিক পড়াশোনার প্রথম ধাপ। আমাদের অনুষদের নাম ছিল "ফ্যাকাল্টি অব ট্রপিক্যাল এন্ড সাব-ট্রপিক্যাল এগ্রিকালচার (ফাকুলতেত ত্রপিচেস্কাভা ই সুবত্রপিচেস্কাভা সেলস্কাভা খাজইয়াস্তভা), ফ্যাকাল্টির ডিন ছিলেন কৃষি-রসায়ন বিশেষজ্ঞ নিকোলাই সিমিওনোভিচ কতলেয়ারভ। আমাদের ফ্যাকাল্টিটি বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য হলেও রুশ ছাত্রছাত্রীরা ও আমাদের সংগে পড়ত। আমাদের ক্লাশ ক্যাপ্টেনের (স্তারস্তা) নাম আনাতোলি ববরুস, আর যে কজন রুশ সতীর্থদের নাম মনে আছে, তারা হল সের্গেই মাজনিচেনকো, দেনিস আদিন্তসোভ, গেন্নাদি কোভালেনকো। থিওরি ও প্রাকটিক্যাল মিলিয়ে জোরসে শুরু হয়ে যায় ক্লাশ। প্রথম বর্ষের বিষয়গুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল উদ্ভিদবিজ্ঞান,অজৈব রসায়ন, এনালাইটিক্যাল কেমিস্ট্রি, উচ্চতর গণিত, পদার্থবিজ্ঞান,

সোভিয়েত সমাজের ইতিহাস ও রুশ ভাষা। বোটানির টিচার আন্তনিনা মাকভকিনার স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। ছোট ভাইদের মাধ্যমে জানতে পারি, সম্প্রতি তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী ও দক্ষ ট্যাক্সোনমিস্ট। রুটিন টপিকসগুলোর পাশাপাশি তিনি যত্ন করে শেখাতেন কি ভাবে মরফোলজিক্যাল বৈশিষ্ট বিচার করে উদ্ভিদ শনাক্ত ও শ্রেণীবিন্যাস করতে হয়। অংকের টিচার জিনাইদা পাভলোভনা ছিলেন দূর্দান্ত প্রকৃতির মহিলা, ক্লাসে নিয়মিত রোলকল করতেন, গরহাজির থাকলে জবাবদিহি করতে হতো। একদিন গণিতের ক্লাস মিস করি। পরের দিন ক্লাসে গেলে টিচার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বলি অসুস্থ ছিলাম। শুনে রেগে গেলেন, বললেন অসুখ হবে কেন, এমনভাবে চলবি যেন অসুখ না হয়। মনে মনে বললাম মিথ্যার উপযুক্ত জবাব। দীপ্ত ও দৃঢ়চেতা মনোভাবের জিনাইদা পাভলোভনা ছিলেন সোভিয়েত নারীদের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশাল ধ্বংসস্তুপ থেকে দেশকে টেনে তোলা ও পুনর্গঠনের কর্মযজ্ঞে নারীরাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। অধিকাংশ পরিবার হয়ে যায় পুরুষশূন্য, যুদ্ধের ময়দান থেকে যারা ফিরে আসে নি। কৃষি কাজে ট্রাক্টর চালিয়ে জমি কর্ষণ, কম্বাইন চালিয়ে ফসল তোলা, ট্রাক চালিয়ে দূরে মালামাল নিয়ে যাওয়া এ সব কিছুই হয়েছে নারীদের হাত দিয়ে। মিল, কলকারখানাগুলোতে ও নারীরা শ্রমিকের কাজ করেছেন। নারীদের এই অবদান সোভিয়েত জনগণ মনে রেখেছে। ১৯৬১ সালে প্রথম নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন মহাকাশে ওড়ার মাত্র দুবছর পর ১৯৬৩ সালে প্রথম নারী নভোচারী ভালেন্তিনা তেরেশকোভা মহাকাশে ওড়েন। তেরেশকোভার পর আরো একজন নারীকে মহাকাশে উড়তে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯ বছর। অজৈব রসায়ন পড়াতেন প্রবীণ অধ্যাপক কনস্তানতিন ৎসিতোভিচ, আর অন্য শিক্ষকদের নাম অনেক চেষ্টা করেও মনে আনতে পারছি না।

দশ নম্বর ছাত্রাবাসে আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছাত্রত্ব পূর্ণমাত্রা পায়। পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়গুলোও পরখ করে দেখার আগ্রহ তেজোদীপ্ত হতে থাকে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চত্বরে তরুণ-তরুণীরা যে ভাবে চিঠি চালাচালির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে এবং পরিণয় গাঢ় হওয়ার পর ঝোপের আড়ালে লুকোচুরি খেলে, আমাদের তাহের ও একই টেকনিক প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। একদিন সে বাংলায় একটি ক্লাসিক প্রেম পত্র লিখে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে "তুই রুসকিতে ভাল কইরা অনুবাদ কইরা দে।" অনুবাদ করতে গিয়ে আমার পেট হাসিতে ফেটে যাবার উপক্রম হল। এ চিঠি হস্তান্তর করে তাহেরের কোন লাভ তো হলই না, উল্টো জানাজানি হয়ে যায়। রুশ সমাজে তরুণ-তরুণীদের পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে ওঠে অনেকটা পাশ্চাত্যের মতই "ডেটিং" পদ্ধতিতে। কোন ছুতোয়, সাধারণত ক্লাসরুমে বা নাচের আসরে পরিচয় ঘটলে শুরু হয় ঘোরাঘুরি, যার জনপ্রিয় রুশ নাম "গুলইয়াত", পাশাপাশি প্রেমিকাকে করতে হয় নানাভাবে আপ্যায়ন, যার নাম "উখাঝিভাত"। এই "গুলইয়াত" ও "উখাঝিভাত" ঠিকমত চললে তা একদিন পরিণয় ও পাকাপোক্ত ব্যবস্থায় রুপ নেয়। কিন্তু উখাঝিভাত" করা সহজ নয়; এর জন্য প্রয়োজন আর্থিক স্বাচ্ছল্যের আর তার জন্য তাহেরের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না।
এ সমস্যায় পড়তে হয়েছে ভবিষ্যতের নেতা মিখাইল গর্বাচোভকেও। তার স্মৃতিকথা অনুযায়ী. পঞ্চাশ দশকের প্রথমার্ধে মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দরী ছাত্রী রাইসা ম্যাক্সিমভনার রুপ দেখে পাগল হয়ে যান। গড়ে তোলেন প্রেমের সম্পর্ক, কিন্তু মহিলা ছিলেন খাদক প্রকৃতির। তাকে "উখাঝিভাত" করতে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন ছিল আর সে জন্য গর্বাচোভকে বন্ধুবান্ধবদের কাছে প্রায়ই ধারকর্জের জন্য হাত পাততে হত।আমাদের পড়াশোনা রুটিনমাফিক এগিয়ে চলে। ডিসেম্বর মাস এসে যায়, প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষাগুলো হয়ে যায়। সামনে নববর্ষ ও শীতকালীন ছুটি।

প্রথম নববর্ষ ("নভি গোদ") উদযাপন

দশ নম্বর ছাত্রাবাসের ৫৪৪ নম্বর রুমটি, যেটিতে হামিদ ভাই ও সুবাসদা থাকতেন তা ছিল আমাদের সোশালাইজেশনের আড্ডাখানা। এরা দুজনই ভাল রান্না করতেন। রুশ বন্ধুমহলে হামিদ ভাইয়ের আউটরিচ সবচেয়ে বেশি ছিল। তাই তাদের রুমে প্রায়ই ভাল রান্নাবান্না হত এবং আমরা ও খেতে যেতাম। আমরা সবাই মিলে ৩১শে ডিসেম্বর রাতটি তাদের রুমেই উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নেই। ২৫শে ডিসেম্বর, বড়দিন, ধর্মীয় উৎসব হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নে এর গুরুত্ব ছিল না। নববর্ষের উদযাপনই ছিল শীতকালীন ছুটির মূল উৎসব। সুবাসদাদের রুমে খাওয়া দাওয়া, বনি-এম ও আব্বা ব্যান্ডদলের রেপ মিউজিক শোনা ও টিভিতে জনপ্রিয় টেলিফিল্ম “Ирония судьбы (ভাগ্যের পরিহাস)” ছবিটি দেখতে দেখতে নববর্ষের প্রতীক্ষা শুরু হয়।
“ছবির কাহিনীর সূত্রপাত মস্কোতে। নায়ক ৩৬ বছর বয়স্ক ডাক্তার-সার্জন এভগেনি লুকাশিন। অবিবাহিত, অনেক মেয়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছে, কিন্তু কোন ঘাটেই তার তরী ঠেকে নি । শেষমেশ সে গালিনা নামে সুন্দরী এক মেয়েকে খোঁজে পেয়েছে এবং তার গোপন ইচ্ছা ছিল নববর্ষের প্রথম প্রহরে প্রেমিকাকে পরিণয়ের প্রস্তাব দিয়ে চমকে দেবে। সে জন্য নববর্ষের আগের দিন

এভগেনি তার সদ্য কেনা অগোছানো এপার্টমেন্টটির (ঠিকানা: থার্ড বিল্ডার্স স্ট্রিট, বিল্ডিং ২৫, এপার্টমেন্ট ১২) একটি চাবি প্রেমিকা গালিনাকে দিয়ে দেয়। ৩১ শে ডিসেম্বর বিকেলে ঐতিহ্য অনুযায়ী এভগেনি তার তিন বন্ধু - পাভেল, আলেকসান্দর ও মিখাইলকে নিয়ে সাউনায় (রুশ ভাষায় বানইয়া) স্নান করতে যায় এবং সেখানে হেভি ড্রিংকস করে। এরপর তারা রওনা হয় বিমানবন্দরে বন্ধু পাভেলকে বিমানে তুলে দিতে, সে যাবে লেনিনগ্রাদ, তার নববধূর সংগে নববর্ষ বরণ করতে। কিন্তু মাতাল মিখাইল ও আলেকসান্দর লেনিনগ্রাদগামী বিমানে পাভেলের পরিবর্তে আধা-চৈতন্যের এভগেনিকে বসিয়ে দেয়। লেনিনগ্রাদ বিমানবন্দরে অবতরণের পর যখন এভগেনির হুঁশ ফিরে আসে তখনো সে বুঝতে পারে না সে মস্কোতে নেই। সে একটি ট্যাক্সি ডেকে বাড়ী যাওয়ার জন্য ড্রাইভারকে মস্কোর ঠিকানা বলে। ট্যাক্সি ড্রাইভার লেনিনগ্রাদেও ঠিক একই নামের রাস্তা ও ভবন খুঁজে পায় এবং এভগেনিকে নামিয়ে দেয়। সিঁড়ি বেয়ে এভগেনি ওপরে উঠে একই নম্বরের এপার্টমেন্ট দেখতে পায় এবং দরজার তালায় তার চাবি ঢোকাতেই দরজাটি খুলে যায়। ঠিক একই ধরনের ইন্টেরিয়র, একই রকম অগোছালো এবং প্রায় একই ধরনের আসবাবপত্রে সজ্জিত এপার্টমেন্ট। এভগেনির কোন সন্দেহের উদ্রেক হল না এবং সে সোফার ওপর শুয়ে পড়ল।
কিছুক্ষণ পর আবার দরজা খোলার শব্দ। ঘরে ঢুকে আসল মালিক ৩৪ বয়স্ক রুশ ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষিকা নাজেশদা (সংক্ষেপে নাদিয়া) ভাসিলিয়েভনা শেভেলেওভা। সে প্রস্তুত হচ্ছিল তার প্রেমিক ইপ্পোলিত গিওর্গিয়েভিচের সঙ্গে নববর্ষ বরণের জন্য। নিজ বাড়ীতে অপরিচিত ঘুমন্ত মানুষ দেখে নাদিয়া ভয়ে আঁতকে উঠে, সে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য লোকটিকে ঠেলতে থাকে যাতে ইপ্পোলিত ঢোকার আগেই তাকে বের করে দিতে পারে। বের হয়ে যাওয়া ত দূরের কথা, এভগেনি প্রতিবাদ শুরু করে। তার মতে তার বাড়ীতে ঢুকেছে অন্য মহিলা। উভয়ে যখন পরস্পরের পাসপোর্ট বিনিময় করে তখন এভগেনি তার ভুল বুঝতে পারে এবং চলে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে; ঘরে ঢুকে ইপ্পোলিতের চক্ষু চড়কগাছ; ঈর্ষার আগুনে জ্বলে উঠে শুরু করে নাদিয়ার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া। এভগেনি দ্রুত বেরিয়ে যায় । কিন্তু একটু পরেই ফিরে আসে মস্কো যাওয়ার টিকেট কেনার জন্য নাদিয়ার কাছে টাকা ধার চাইতে। নাদিয়া কোন কথা না বলে মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে এভগেনির হাতে দেয়। এটি দেখে ইপ্পোলিত ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং বেরিয়ে যায়। এভগেনি ইপ্পোলিতের পেছন পেছন ছুটতে থাকে তাকে ফিরিয়ে আনতে কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। নাদিয়া এভগেনিকে কিছুক্ষণ থাকার অনুমতি দেয় যাতে মস্কোতে তার প্রেমিকা গালিনাকে ফোন করে পরিস্থিতি বোঝাতে পারে কিন্তু ফোন করতে করতে এভিগেনি যখন গালিনাকে পেল সে কোন কথাই শুনতে চায় না। এদিকে রাত বারোটায় নববর্ষের ঘন্টা বাজছে, আর ইপ্পোলিত পাগলের মত তার গাড়ী নিয়ে লেনিনগ্রাদের রাস্তায় দৌড়াচ্ছে। বাধ্য হয়ে একই ঘরে থাকার কারণে এভগেনি আর নাদিয়ার মাঝে সহানুভূতিবোধ জেগে উঠতে শুরু করেছে। এরই মাঝে ফিরে আসে ইপ্পোলিত, যখন দেখে এভগেনি এখনো বসে আছে শুরু হয়ে যায় দুজনে হাতাহাতি মারামারি। এবার নাদিয়া দুজনকেই ঘর থেকে বের করে দেয়। কিন্তু ভুলে রেখে যাওয়া ব্রিফকেসটি, যার ভেতর ছিল সাউনায় স্নানে ব্যবহৃত ঝাঁটা, ফেরত নেওয়ার জন্য এভগেনি আবার ফিরে আসে। এবার নাদিয়া তাকে থাকতে দেয়। কিছুক্ষণ পর মাতাল হয়ে ফিরে আসে ইপ্পোলিত, আরো ড্রিংকস করতে করতে গাইতে থাকে গান, তারপর কাপড়চোপড় পড়েই করে স্নান। এরপর দুজনকে উদ্দেশ্য করে বলে এত অল্প সময়ে পুরোনোকে ধ্বংস করে দেয়া যায়, কিন্তু নতুন কিছু সৃষ্টি করা খুব কঠিন। এই বলে সে বেরিয়ে যায় এবং আর ফিরে আসে নি। ইপ্পোলিতের কথা নাদিয়ার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সে ধরে নেয় এভগেনির সংগে তার কোন ভবিষ্যৎ নেই এবং যা ঘটেছে তা শুধুই খেলা। পরদিন ভোরে বিমানে করে মস্কো ফিরে আসে এভগেনি এবং সঙ্গে নিয়ে আসে নাদিয়ার একটি ছবি। নাদিয়া দেখতে পায় এভগেনি আবারো ভুল করে রেখে গেছে তার ব্রিফকেসটি। নাদিয়ার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এটাই তার ভাগ্য। ওই দিনই সে ব্রিফকেসটি নিয়ে পরের ফ্লাইটে মস্কোতে অবতরণ করে এবং চিরকাল প্রেমিকের সঙ্গে একত্রে থাকার জন্য।"

রাত বারটায় ক্রেমলিনের ঘন্টাগুলো (ক্রেমলিওভস্কিয়ে কুরান্তি) বেজে ওঠে। টিভি পর্দায় ভেসে আসে সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেঝনেভের জলদগম্ভীর কন্ঠস্বরে সোভিয়েত জনগণের প্রতি নববর্ষের শুভেচ্ছা (পাজদ্রাভলেনিয়ে সোভিয়েতস্কামু নারোদু)। টেবিলে রাখা শ্যাম্পেনের বোতলগুলোর কর্ক বন্ধনমুক্ত হয়ে ঠাস ঠাস করে ছাদের দিকে উড়ে যায়। গড়িয়ে পড়ে ফেনিল শ্যাম্পেনের তরল ধারা। সবাই যার যার গ্লাস ভর্তি করে একে অপরের গ্লাসে ছুঁয়ে বরণ করে নববর্ষকে। তারপর আলো নিভিয়ে দিয়ে ৫৪৪ নম্বর রুমটি মেতে ওঠে উদ্বাহু নৃত্যে। কখন যে রাত গড়িয়ে ভোরের আলো ফুটে ওঠেছে তা টেরই পাই নি।

বাংলাদেশ ছাত্র সংগঠন সোভিয়েত ইউনিয়ন- এর কেন্দ্রীয় সম্মেলনে প্রথম অংশগ্রহণ

সনটি খুব সম্ভবত: ১৯৭৮। ওই বছর কেন্দ্রীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (МГУ) । কিন্তু মূল আকর্ষণ ছিল Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Patrice Lumumba Peoples

Friendship University)। কঙ্গোর মুক্তি আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বার নামানুসারে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকাল থেকে মুক্ত এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শিক অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন। ১৯৬০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তৎকালীন সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন। ১৯৯২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর ইয়েলৎসিন চক্রের আক্রোশের শিকার হয় বিশ্ববিদ্যালয়টি। এর নাম থেকে মুছে ফেলা হয় প্যাট্রিস লুমুম্বার নাম, তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপন করার প্রতীক। বিশ্ববিদ্যালয়টির মূল ক্যাম্পাস ছিল তখনকার মস্কোর উপকণ্ঠে মিকলুকা-মাখলায়া স্ট্রিটে; যাওয়ার রাস্তা ছিল ইউগো-জাপাদনায়া মেট্রোতে এসে উপরে ওঠে দশ-পনর মিনিট বাসে ভ্রমন।

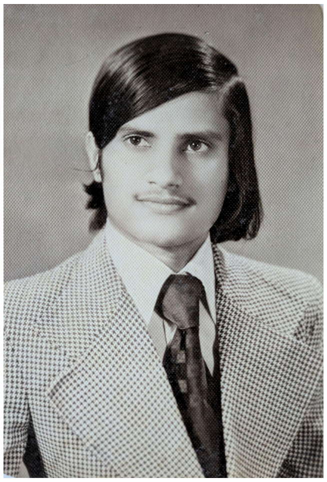

লেনিনগ্রাদ, মুরমানস্ক, ভারোনেঝ, মিনস্ক, কিয়েভ, খারকভ, দানেৎস্ক, জাপারোঝিয়ে, খেমেলনিৎস্কি, দেনেপ্রোপেত্রোভস্ক, কিশিনেভ, রোস্তভ, ওদেসা, আস্ত্রাখান, সিমফেরাপল, ভল্গাগ্রাদ (স্তালিনগ্রাদ), ক্রাসনাদার, প্যাতিগোর্স্ক, ইয়েরেভান, বাকু, তাশখন্দ সহ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য শহরে অধ্যয়নরত বাংলাদেশের ছাত্র প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে যেসব বিয়য়বস্তু আলোচিত হয়, তার কোন গুরুত্ব এখন আর নেই। তবে স্মৃতিতে জ্বলজ্বল হয়ে আছে, সে সময়ের তারুণ্যের উচ্ছ্বাস আর আবেগ; উপচে পড়া প্রাণশক্তি। অনেক বন্ধু যাদের সংগে একই বিমানে চড়ে দেশ থেকে এসেছিলাম, তাদের সংগে আবার নতুন করে দেখা হল। এখানে নতুন করে পরিচিত হই মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশের এক ঝাঁক মেধাবী ও প্রাণোচ্ছল সিনিয়র ভাইদের সঙ্গে - মোকতার ভাই, অমল দা (অমল কৃষ্ণ হালদার, মেধাবী ছাত্রদের মাঝে উজ্জ্বলতম মুখ), আজিজ ভাই, মকসেদুল হামিদ ভাই, সুব্রত দা, মর্তুজা ভাই, গণেশ দা, তাকসিম ভাই, পাটোয়ারী ভাইদের সঙ্গে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদে যারা পড়তেন এবং পরবর্তীতে পেশাগত সূত্রে যাদের সম্পর্ক গভীর হয়েছে তারা হলেন শফিউল আলম ভাই, নিজাম আল হোসাইনী ভাই, শঙ্কর পাল দা, সুদর্শন পাল দা (প্রয়াত)। হামিদ ভাই আস্ত্রাখান থেকে আগত প্রনথদার (প্রনথ বড়ুয়া) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের প্রায় সবাই বাংলাদেশে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুপরিচিত নাম। শুধু সময় বাঁচাতে এদের আমি বর্তমান কনটেকস্টে পরিচয় করিয়ে দেই নি। যতদূর জানি, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর অধ্যাপক ভ্লাদিমির স্তানিস ছিলেন সোভিয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির সভাপতি, সেই সূত্রে বাংলাদেশের ছাত্রদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। কিছু দারুন স্মৃতি নিয়ে আমরা ক্রাসনাদার ফিরে আসি।

শীতের ছুটি শেষে আবার শুরু হয় রুটিন মাফিক ক্লাস এবং গ্রীষ্মের শুরুতে প্রথম বর্ষের পরীক্ষার প্রস্তুতি। এবার ব্যতিক্রম ছিল বোটানী পরীক্ষা। থিওরেটিক্যাল ও ল্যাব প্রাকটিক্যালগুলোর পাশাপাশি ছিল দুসপ্তাহের ফিল্ড প্রাকটিক্যাল ওয়ার্ক। উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলীয় অঞ্চলে জন্মানো উদ্ভিদ জগতের সংগে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য আমাদের বিমানে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় প্রায় একই আবহাওয়ার জর্জিয়া প্রজাতন্ত্রের কৃষ্ণ সাগরের পাড়ে বন্দর শহর সুখুমিতে। সেখানে আমরা বোটানীর শিক্ষক আন্তোনিনা মাকভকিনার নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায়, ঘুরে ঘুরে নানা জাতের উদ্ভিদ সংগ্রহ করে এলবাম তৈরি করি, এর

পর চলে শ্রেণীবিন্যাস ও উদ্ভিদ শনাক্তকরণ। কোনমতে একটি ডিগ্রি বিদেশী ছাত্রদের হাতে ধরিয়ে দেয়াটা সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়াশোনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, তাদের লব্ধ জ্ঞান যাতে প্রাসঙ্গিক হয় এবং তা তারা কর্মক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে স্ব স্ব দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে, এ সদিচ্ছারই প্রতিফলন ছিল এ ধরনের ফিল্ড প্রাকটিক্যাল ওয়ার্ক।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়: দ্বিতীয় বর্ষের শুরু

সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাশ। টেকনিক্যাল সাবজেক্টগুলোর মাঝে ছিল ভৌত ও কলয়ডাল রসায়ন, জৈব রসায়ন, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, এনিমেল সায়েন্স, এনটোমোলজি ও আরো কয়েকটি বিষয়। সোশাল সায়েন্সে ইতিহাসের পাশাপাশি যোগ হয় দর্শন, মূলতঃ মার্কসীয় দর্শন - দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ - সমাজতন্ত্রের আদর্শিক ভিত সম্পর্কে জ্ঞান দেয়ার প্রথম ধাপ। এটি আমি দারুন এনজয় করতাম, আমার এখনো মনে আছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণা টিচার এই বলে অবতারণা করলেন "এতা মাতেরিয়ালিস্তিচেস্কোয়ে পানিমানিয়ে ইস্তোরি (এটি হল ইতিহাসের বস্তুগত উপলব্ধি)"। জোর করে কাউকে সমাজতন্ত্রের বড়ি গেলানোর প্রচেষ্টা সোশাল সায়েন্সের শিক্ষকদের ছিল না। তারা চাইতেন আমরা বিষয়বস্তুগুলো পড়ি, অনুধাবন করি, পরীক্ষা দিয়ে পাশ করি। বিদেশী ছাত্ররাই বরং ছিল সুবিধাবাদী। লাতিন আমেরিকার কিছু দেশ, যেমন - চিলি, কিউবা, নিকারাগুয়া এবং ফিলিস্তিন ছাড়া অধিকাংশের সমাজতন্ত্রের প্রতি কোন পূর্ব অনুরাগ ছিল না। এদের অনেকেই সোভিয়েত সমাজতন্ত্র পছন্দ করত না, কিন্তু শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকার জন্য নিজেদের মনোভাব গোপন করে চলত এবং সমাজতন্ত্রের ভেক সমর্থক সাজত।

দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারের শেষ হয়ে আসে ১৯৭৮ সালের জুনের দিকে। মৃত্তিকা বিজ্ঞানের ফিল্ড প্রাকটিক্যাল করতে জর্জিয়া প্রজাতন্ত্রের বন্দর শহর সুখুমিতে আবার আমাদের বিমানে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারই কিছু স্মৃতি নিচের দুটি ছবিতে। প্রথম ছবিতে পাহাড়ের গায়ে গর্ত খুঁড়ে সয়েল প্রোফাইল সংগ্রহের সময় ক্লান্তি দূর করতে কিছুটা বিশ্রাম। আমার পেছনে গেঞ্জি গায়ে বসা খলিল; ঠিক পেছনে শার্ট গায়ে ছেলেটি পেরুর; পেছনে বোতাম খোলা শার্ট গায়ে মানসদা দাঁড়িয়ে; আমার ডান পাশে বসা রুশ ছেলেটি আমাদের ক্লাশ ক্যাপ্টেন আনাতোলি ববরুস; এর পরের রুশ ছাত্রটির নাম মনে নেই; তারপর খালি গায়ে, ঘড়ি হাতে, সিগারেট মুখে রুশ ছেলেটির নাম সের্গেই (সিরিওঝা) মাজনিচেনকো; সিরিওঝার ডানপাশে সানগ্লাস পরিহিত সিগারেট মুখে ছেলেটি সাকাফ সাকাফ আব্দুর রহমান (ইয়েমেন);পরে শার্ট গায়ে বসা ছেলেটি (ভাবুক প্রকৃতির) হিশাম আবদাল্লাহ (ফিলিস্তিন);হিশামের সামনে মাথা নিচু করে বসা ছেলেটি ইথিওপিয়ার; একেবারে সামনে বসা হ্যাট পরিহিত পাশে শাবল রাখা ছেলেটি খুব সম্ভবত রদ্রিগেজ (পেরু/কোস্তা রিকা);আমার বাম দিকে হেলান দিয়ে বসা ছেলে টি বুরকিনা ফাসোর; এরপরের শোয়া ছেলেটি ইথিওপিয়ার; সিরিওঝার ঠিক পেছনে বসা শ্মশ্রুমন্ডিত ছেলেটি জাইয়েদ (জর্দান); তার পেছনে গাছে ঠেস দিয়ে বসা হাসিমুখের ছেলেটি মনসুর (সিরিয়া বা ফিলিস্তিন); মনসুরের বাম দিকে মাথা নিচু করে বসা ছেলেটি রুশ দিমিত্রি (দিমা) আদিনৎসোভ। এরপর সিগারেট মুখে পরের রুশ ছেলেটির নাম মনে পড়ছে না। দ্বিতীয় ছবিতে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে, বাঁ থেকে চিলি থেকে আগত ছাত্রী ম্যারিয়াম মার্তিনেজ, পেরুর ছাত্রী গ্লোরিয়া কার্দানেজ; এরপর খলিল, আমি ও রুশ ছাত্র গেন্নাদি। মানসদাকে পেছনে দাঁড়ানো অবস্থায় আবছা দেখা যাচ্ছে।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়: যৌথ থামারে ভ্রমন

বিদেশী ছাত্ররা পড়াশোনা শেষে যার যার দেশে ফিরে গিয়ে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হবে না তা সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ ভাল করেই জানতেন। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সোশাল সায়েন্সের বিষয়গুলো পড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল, এরা যেন অন্তর্মুখী শিক্ষিত রোবট না হয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ পেশাজীবি এবং একই সঙ্গে সমাজ-সচেতন হয় এবং জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য আমাদের প্রায়ই বিভিন্ন যৌথ থামারে নিয়ে যাওয়া হত (সোভিয়েত দেশে প্রায় সব ভূমি সম্পদের মালিক ছিল রাষ্ট্র)। এগুলো ভাল কি মন্দ, টেকনিক্যাল এফিসিয়েন্সি কাঙ্খিত কিনা, লাভজনক না লোকসানী, এ সব বিষয়ে জাজমেন্ট দেয়ার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আমরা তখন শুধুই ছাত্র, শিক্ষকরা যা

বলতেন সবই বিশ্বাস করতাম, চোখে যা দেখতাম সবই ভাল লাগতো। যৌথ খামারের সংক্ষিপ্ত রুশ নাম ছিল "কালখোজ"। এক একটি কালখোজ ছিল ঢাউস সাইজের। ১৯৬০ সালে একটি কালখোজে গড় জমির পরিমান ছিল ২,৭৪৫ হেক্টর (১ হে: = ২.৪৭১ একর); এক একটি কালখোজে গড়ে ৩৮৩টি কৃষক পরিবার (যৌথখামারী) বসবাস করত। পক্ষান্তরে এ সময় যুক্তরাষ্ট্রে একটি বাণিজ্যিক কৃষি ফার্মের গড় আয়তন ছিল ১২২.৬ হে: (এ সব তথ্য পরে জেনেছি)। কালখোজগুলোর বাণিজ্যিক উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে লাভ-লোকসানের পরিবর্তে জনকল্যাণ ছিল মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। গ্রামাঞ্চলে কালখোজগুলোকে ঘিরে আবর্তিত হত সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড। কালখোজগুলো পরিচালনা করত কিন্ডারগার্টেন, এলিমেন্টারি স্কুল, গণস্নানাগার (সাউনা, রুশ ভাষায় বানইয়া), স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র, ক্লাব ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ড, দোকানপাট এবং অবকাঠামোর পরিচর্যা। একটি বড় কালখোজ মিনি টাউনশিপের মত দেখাত, যেখানে পাকা রাস্তাঘাট ও বিজলী সরবরাহের সুবিন্যস্ত নেটওয়ার্ক ছিল। যৌথ খামারীরা সকল নাগরিক সুবিধাদি ভোগ করত।

কৃষির যৌথায়ন ছিল ১৯৩৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ইওসিফ স্তালিনের নির্দেশনায় সমাজতন্ত্র বিনির্মানের প্রথম ধাপের সবচেয়ে বড় সাফল্য। কিন্তু এর অভিজ্ঞতা সুখকর নয়; এটি করতে গিয়ে চালাতে হয়েছে ধারাবাহিক নির্মম শ্রেণীসংগ্রাম। জোর জবরজস্তি করে জমি ক্রোক, সাইবেরিয়াতে নির্বাসন, প্রয়োজনে রক্তপাত এ সবের মাধ্যমে ভূস্বামী (কুলাক) শ্রেণীকে ধ্বংস করে দিয়ে সব কৃষি জমিকে নিয়ে আসা হয় জনগণের মালিকানায় যেখানে রাষ্ট্রের তত্বাবধানে গড়ে উঠে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আদলে বিশাল আকৃতির যৌথ খামার। সব কৃষক পরিবারগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এ সব যৌথ খামারে। যৌথ খামারগুলোর নামকরণে ব্যবহৃত হত বিপ্লব ও দেশপ্রেমের সঙ্গে জড়িত প্রতীকী চিহ্নগুলো, যেমন, অক্তাইয়াবরস্কি (অক্টোবর), পুত ইলিচা (ইলিচের (লেনিন) পথ), পুত ক কমুনিজমু (কমিউনিজমে যাওয়ার রাস্তা), ক্রাসনায়া জারইয়া (লাল প্রভাত), রাসসভিয়েত (ভোর),পাবেদা (বিজয়), ক্রাসনি পার্তিজান (লাল গেরিলা), এ ধরনের আবেগ-জাগানো নাম। এ রকম একটি যৌথ খামারে দ্বিতীয় বর্ষের শেষ দিকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় প্রাকটিক্যালের অংশ হিসেবে।

কালখোজে আমাদের থাকতে দেয়া হয় স্কুলের ডরমিটরিতে। শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে গাছ গাছালির ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের মতই গ্রাম। ভোরে ঘুম ভাঙত মোরগের ডাকে। মাটি, অরণ্য আর বুনোফুলের গন্ধে মন ভরে যেত। দিগন্ত জোড়া বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ, তখন মূল খাদ্যশস্য গম কর্তনের সময়, মাঠে আমাদের সময় কাটত কৃষি যন্ত্র ব্যবহার করে কি ভাবে একই সংগে ফসল কাটা, সংগ্রহ,, মাড়াই, পরিবহন, গুদামজাত করা এ সব ও অন্যান্য ফার্ম অপারেশন পর্যবেক্ষণ করে। কিষাণ-কিষাণীরা যে যার কাজ করে যাচ্ছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ব্রেকটাইমে তাদের সংগে আমরা আলাপ করতাম। আমাদের রুশ ভাষায় কথা বলতে দেখে ওরা খুব কৌতুহল বোধ করত এবং আগ্রহভরে আমাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন হত। পশ্চিমীদের মত রুশরাও তাদের দৈনন্দিন হালকা মেজাজের কথোপকথনে প্রচুর স্ল্যাং (সর্বসাধারণে উচ্চারণ-অযোগ্য আলংকারিক শব্দ) ব্যবহার করে। আমরা ততদিনে এসব স্ল্যাং খুব ভাল করেই শিখে গেছি। তাই সহজেই ওদের সঙ্গে জমিয়ে আলাপ করতে পারতাম। এরা সবসময়ই হাসিখুশি থাকত। আমাদের দেশে কৃষক যেমন ফসল কাটার সময় নানা বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে, যেমন ফলন কেমন হবে, সময়মত কাটতে পারবে কিনা, বেচতে গেলে পণ্যের সঠিক দাম পাবে কিনা, এ ধরনের কোন দূঃশ্চিন্তা সোভিয়েত কৃষকদের ছিল না।

কৃষির যৌথায়ন, ও যান্ত্রিকীকরণ এ দুয়ে মিলে চিরায়ত রুশ কৃষক সমাজের চেহারা পাল্টে দেয়। বিপ্লবের পর কৃষিজমির মালিকানা ও গ্রামীন উৎপাদন ব্যবস্থার খোলনলচে পাল্টে দিয়ে কৃষিকে পরিণত করা হয় দ্রুত নগর-ভিত্তিক শিল্পায়নের সহায়ক খাত হিসেবে। বিশাল আকৃতির যৌথ খামারগুলো গড়ে তোলা হয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের আদলে, কিছু যৌথ খামারকে রূপান্তরিত করা হয় এগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে (আগ্রো-প্রমিশলেন্নি কমপ্লেক্স), যেখানে প্রাথমিক কৃষি পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পণ্য প্রক্রিয়াজাত করারও কারখানা গড়ে ওঠে। প্রতিটি যৌথ ফার্মের ছিল কৃষি যন্ত্রপাতির নিজস্ব পার্ক এবং বিশেষজ্ঞ দল (কৃষিতত্ববিদ, ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিকস) যাদের দায়িত্ব ছিল ফার্ম প্রোডাকশান প্লান বাস্তবায়নে কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রশিক্ষণগত সহায়তা দেয়া। গবেষণা সিস্টেম থেকে উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তির মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন এদের তত্বাবধানে যৌথ খামারগুলোতে হত।

প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও অবলম্বনের মাঝে সংযোগ ঘটানোর জন্য কৃষি সম্প্রসারণের মত কোন সরকারি দফতর ছিল না এবং এর প্রয়োজনও ছিল না। ফসল উৎপাদন যাই হোক না কেন, যৌথ খামারের সদস্য কৃষকরা প্রতি মাসে বেতন পেতেন নির্ধারিত হারে, অনেক সময় সঙ্গে থাকত বোনাস। এ ছাড়া প্রতিটি কৃষক পরিবারকে তাদের বাড়ীর সামনে বেশ কিছু জায়গা বরাদ্দ দেয়া

হত (রুশ ভাষায় "আগারোদ" বা "উসাদবা) ব্যক্তিগত ভোগের জন্য। এখানে তারা যে সব কৃষি পণ্য (শাকসব্জি, ফলমূল, হাঁসমুরগী, ডিম, ইত্যাদি) উৎপাদন করতেন নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে তার উদ্বৃত্ত বাজারমূল্যে (যা সরকারি দোকানগুলোর দামের চেয়ে সবসময় বেশি থাকত) কৃষি মার্কেটে (কালখোজনি রিনক) বিক্রি করতেন। তাই যৌথ খামারের কৃষকদের জীবনযাত্রা ছিল সচ্ছল, আর্থিক সামর্থের বিচারে কৃষক পরিবারগুলোর মাঝে খুব একটা তফাৎ ছিল না। খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য, জীবিকা নিরাপত্তা এ সব উদ্বেগ ও দুঃশ্চিন্তা এদের কল্পনার অতীত ছিল।

একদিন টিচার আমাদের নিয়ে গেলেন কালখোজের রুশ-ঐতিহ্যের গণস্নানাগারে (রুশ ভাষায় "বানইয়া")। ভিতরে ঢুকে অনুভূত হল ভীষণ তাপ। স্টিমের ধোঁয়া বেরুচ্ছে, প্রায় বিবস্ত্র কিছু মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে কোন গাছের পাতা হাতে নিয়ে গায়ে বুলিয়ে যাচ্ছে। ধোঁয়ায় ও তাপে প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। তাড়াতাড়ি স্নানাগার থেকে বেরিয়ে আসি। কালখোজের ক্লাবে সন্ধে বেলায় খোলা জায়গায় ব্যান্ড মিউজিকের তালে নাচের অনুষ্ঠান হত। কৌতুহলভরে একদিন আমরাও সেখানে গেলাম। দাঁড়িয়ে কালখোজের তরুণ-তরুণীদের নাচ দেখছি। হঠাৎ করে এক তরুণী আমার কাছে এসে ওর সঙ্গে নাচার আহ্বান জানায়। সচকিত হয়ে ওর হাত ধরে এগিয়ে যাই। একটু আড়ষ্ট বোধ হচ্ছিল, পরক্ষণেই ওর পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে নাচতে থাকি এবং একটু একটু শিহরণ জাগতে থাকে।

এ রকম অনেক স্মৃতি নিয়ে কালখোজ থেকে ফিরে আসি। আমাদের শিক্ষা জীবন থেকে খুব দ্রুত দুটি বছর কেটে যায়। সেকেন্ড ইয়ারের সেকেন্ড সেমিস্টার কৃষি-সম্পর্কিত কারিগরি বিষয়গুলোতে ঠাসা ছিল: কৃষি রসায়ন, উদ্যানতত্ব, উদ্ভিদ রোগতত্ব, অণুজীব বিদ্যা, ভূতত্ব ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ভেটেনারি মেডিসিন। ১৯৭৯-র সেপ্টেম্বর থেকে আমরা তৃতীয় বর্ষে উন্নীত হই। যে কারিগরি বিষয়সমূহ এ সময়ে অন্তর্ভূক্ত হয় সেগুলো ছিল শস্য উৎপাদন (রাস্তেনিয়েভোদস্তভো), কৌলিতত্ব (গিনেতিকা), উদ্ভিদ শারীরতত্ব ও প্রাণরসায়ন (ফিজিওলগিয়া ই বিয়োখিমিয়া রাস্তেনি), জিওডেসি (গিওদেজিয়া),সেচ ও ভূমি উন্নয়ন (আরাশেনিয়ে ই মেলিওরাৎসিয়া জিমেল), কৃষি-আবহাওয়াতত্ব (আগ্রো-মেতেরোলগিয়া), বনবিদ্যা (লেসাভোদস্তভো),পরিবেশ সংরক্ষণ (আখ্রানা প্রিরোদি) এবং আরো কয়েকটি বিষয়। লক্ষ্যণীয়, ভবিষ্যতের কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতন করে তোলার জন্য সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থায় জোর দেয়া হত তখন, যখনও বিশ্বজুড়ে গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ-জনিত বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ূর পরিবর্তন নিয়ে তেমন কোন উদ্বেগের সৃষ্টি হয় নি।

আমাদের ফিজিওলোজি পড়াতেন প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী এভগেনি পাভলোভিচ আলইয়োশিন। এ সময় তিনি একইসঙ্গে ছিলেন ক্রাসনাদারে অবস্থিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা ইনস্টিউটের মহাপরিচালক। তাঁর লেকচারগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতাম। যেমন তাঁর ছিল বিষয়ের ওপর দক্ষতা তেমনি উপস্থাপন করার কৌশল। এখনও মনে পড়ে কিভাবে তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে রাসায়নিক সমীকরণ লিখে ও ডায়াগ্রাম এঁকে আমাদেরকে "ৎসিকল ক্রেবসা (ক্রেবস সাইকেল)" বুঝিয়েছিলেন। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার C3 এবং C4 পাথওয়ের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে আমাদের তখন বলেছিলেন ধানকে কোনদিন C4 উদ্ভিদে রুপান্তর করা সম্ভব হলে এর ফলন বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।
শস্য উৎপাদন পড়াতেন অধ্যাপক গিওর্গি পাভলিউকভ ও আরো দুজন তখন-তরুণ শিক্ষক নিকোলাই নিকোলায়েভিচ নেশ্যাদিম ও ভ্লাদিমির মালিশেভ। শস্য উৎপাদন ক্লাশের প্রথম দিন অধ্যাপক পাভলিউকভ উল্লেখ করলেন বিশ্বখ্যাত রুশ-সোভিয়েত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী “সেন্টার অফ অরিজিন অফ কাল্টিভেটেড প্লান্টস" তত্বের জনক নিকোলাই ইভানোভিচ ভাভিলভের নাম এবং তত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন। জেনেটিক্স পড়াতেন দুই ম্যাডাম ভালেনতিনা ভাসিলিয়েভনা এফরেমভা ও ইউলিয়া তিখোনভনা আইস্তভা।ফরেস্ট্রি পড়াতেন প্রবীণ রাশভারী অধ্যাপক ফিওদর সাভভিচ বারিশমান। এই বিষয়ের একটি বড় অংশ ছিল আজকের ধ্যান-ধারণায় এগ্রো-ফরেস্ট্রি এবং ল্যান্ডস্কেপিং। সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষির প্রাকৃতিক দূর্যোগগুলোর প্রধান একটি ছিল শুষ্ক ধূলিঝড় (সুখাভেই) এবং এ থেকে উদ্ভুত খরা। এর প্রতিকার হিসেবে খামারগুলোতে গড়ে তোলা হয় কয়েক স্তরের সবুজ গাছের বেষ্টনি, রুশ ভাষায় “পলেজাশ্যিতনিয়ে লেসাপোলাসি", ইংরেজিতে যা "ফিল্ড-প্রটেক্টিং ফরেস্ট স্ট্রিপ"। এটি "উইন্ড ব্রেক" হিসেবেও পরিচিত। সোশাল সায়েন্সে এবার যোগ হয় রাজনৈতিক অর্থনীতি, এটি পড়ানো হত সমাজতন্ত্র ও পূঁজিবাদ এই দুই পর্বে। এটি পড়াতেন সহকারী ডিন ইউরি লুকামেৎস। দর্শন ছিল মূলতঃ তাত্বিক, কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রতিপাদ্য ছিল পূঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার বাস্তব অভিজ্ঞতা।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়: তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়ন

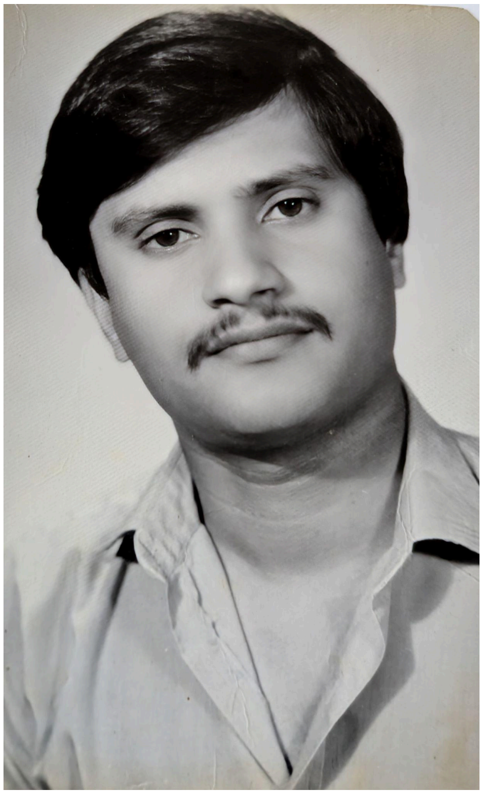

তৃতীয় বর্ষ থেকে পড়াশোনার বোঝা বাড়তে থাকে। আমাদের সামনে দুরকম চ্যালেঞ্জ ছিল। শুরুতে শূন্য থেকে রুশ ভাষা শিখতে হয়েছে এই ভাষায় দেয়া পাঠ অনুধাবন ও আত্মস্থ করতে। পরের চ্যালেঞ্জটি ছিল রুশ ভাষায় যা শিখছি, তা দেশের প্রেক্ষাপটে যাতে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে পারি, তার জন্য লব্ধ জ্ঞানকে নিজের চেষ্টায় যতদূর সম্ভব বৈশ্বিক পরিমন্ডলে ইংরেজিতে প্রকাশের সামর্থ্য অর্জন করা। এ জন্যে অনেকদিন বিকেলে সময় কাটত ইনস্টিউটের লাইব্রেরীতে কৃষিতত্ব, কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন সংক্রান্ত ইংরেজি লিটারেচার পড়ে। বইয়ের পাশাপাশি সহজলভ্য ছিল বৈজ্ঞানিক জার্নাল ও সাময়িকী, যেমন ক্রপ সায়েন্স, এউফিটিকা, জেনেটিক্স, আমেরিকান সোসাইটি অফ এগ্রোনমি থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন জার্নাল।
টেকনিক্যাল সাবজেক্টগুলোর ক্লাশ গতানুগতিক থাকলেও পলিটিক্যাল ইকোনমির ক্লাশগুলো থাকত বিতর্কে ভরপুর। বিদেশি ছাত্রদের বেলায় ভিন্নমত প্রকাশে কোন বাধা না থাকার কারণে তারা প্রায়ই বিতর্কে লিপ্ত হত এবং এই সাবজেক্টের শিক্ষককে ক্লাসের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বেগ পোহাতে হত। কারণ সমাজতন্ত্র সম্পর্কে পারসেপন ছিল দুরকমের: একটি বইপত্র থেকে নেয়া ক্লাসিক্যাল তাত্বিক-আদর্শিক অক্টোবর বিপ্লবের গোড়ার দিকের; আর একটি জীবন থেকে নেয়া, চোখের সামনে যা ঘটছে তা দেখে, যাকে বলা হত "সোভিয়েতস্কায়া দেইস্তভিতেলনস্ত (সোভিয়েত বাস্তবতা)"। বলা বাহুল্য, দুয়ের মাঝে বৈসাদৃশ্য ও অসঙ্গতি ছিল প্রচুর। ১৯৭০-এর শেষ ভাগে চলছে সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্বিতীয় প্রজন্মের নেতাদের শাসন, যাদের প্রায় সবাই বয়োবৃদ্ধ

এবং বেড়ে উঠছে তৃতীয় প্রজন্ম, যাদের দাদারা অক্টোবর বিপ্লব সাধন করেছেন ও দেখেছেন। এই প্রজন্মের আশা-আকাঙ্খা ছিল তাদের দাদাদের আশা-আকাঙ্খা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

সোভিয়েত নেতৃত্ব চেষ্টা করতেন আদর্শিক প্রচারণা চালিয়ে সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধকে এই প্রজন্মের ভেতর সঞ্চালিত করে তা সরকারি ভাষ্যের ফ্রেমে বন্দি করা। এই প্রক্রিয়াটির নাম ছিল অদ্ভুত - "নতুন মানুষ গড়া (সজদানিয়ে নোভাভা চিলাভেকা)"। এই নতুন মানুষ গড়ার মূল সাংগঠনিক দায়িত্ব ছিল "কমসোমলের" ওপর - সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠন "যুব কমিউনিস্ট লীগ"। বলশেভিক বিপ্লবের ঐতিহ্য, সমাজতন্ত্র বিনির্মানে আগের প্রজন্মের বিপুল আত্মত্যাগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশাল বিজয়, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুদয় ও এর নেতৃত্বে বিকল্প পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের আবির্ভাব, স্নায়ু যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমানে-সমান পাল্লা দিয়ে চলা - এ সব থেকে উদ্ভুত দেশপ্রেমিক অনুভূতি দিয়ে তরুণ সমাজের চিন্তার ধারাকে প্রভাবিত করা ছিল "নতুন মানুষ গড়া" প্রকল্পের মূল হাতিয়ার। এর সাফল্য ছিল আংশিক। তরুণ প্রজন্ম দেশপ্রেমে উজ্জীবিত ছিল ঠিকই; কিন্তু আগের প্রজন্মের মত শুধু আত্মত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বস্তুত: ১৯৭০-এর শেষভাগের সোভিয়েত সমাজ ১৯৩০ দশকের মত ছিল না। দীর্ঘ চার দশকে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়নের সোপান বেয়ে সোভিয়েত

ইউনিয়নে তখন বিকাশ ঘটেছে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (আয়ের বিচারে, মার্কসীয় অর্থে নয়)। যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আশা আকাঙ্খা ছিল ভিন্নতর যা সরকারি ভাষ্যের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল না। মোদ্দা কথায়, সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের চলমান ধারা এ সময়ের চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত ছিল না। এটি অনুভূত হত, কিন্তু প্রকাশ করা যেত না। তাই সোভিয়েত জনগণ তাদের সমাজের অসঙ্গতিগুলো ফুটিয়ে তোলার জন্য আশ্রয় নিতেন রাজনৈতিক কৌতুকের। এই কৌতুকগুলো ছিল বহুল প্রচলিত কিন্তু মজাদার অ-উচ্চারণযোগ্য স্ল্যাং-এ ভরপুর। আমরা নিজেদের মধ্যে এ কৌতুকগুলো মনে করলে এখনো হাসিতে পেট ফেটে যায়।

এ সময়ের পরিবর্তনকে জনগণ যে ভাবে দেখতে চাইত, সে পথে না হেঁটে সোভিয়েত নেতৃত্ব বেছে নেন বিকল্প পথ যার সঙ্গে বাস্তবতার মিল ছিল সামান্যই। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর (দেশের শীর্ষস্থানীয় নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা কেন্দ্র) প্রভাবশালী সদস্য ও তাত্বিক গুরু মিখাইল আন্দ্রেইয়েভিচ সুসলভ স্তালিন-পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্মাণ ও সমাজ গঠনে যে পরিবর্তনগুলো ঘটেছে তা চিত্রিত করার জন্য উত্থাপন করেন "পরিপক্ক সমাজতন্ত্রের (জ্রেলি সোৎসিয়ালিজম)" নতুন তাত্বিক প্রস্তাবনা । এই তত্ব আইনসিদ্ধ করার জন্য ১৯৭৭ সালে তৃতীয় বার দেশের সংবিধান সংশোধন করা হয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় প্রথম সংবিধান গৃহীত হয় লেনিনের আমলে ১৯১৮ সালে, দ্বিতীয়টি স্তালিনের আমলে ১৯৩৬ সালে, এবং তৃতীয়টি ব্রেঝনেভের আমলে ১৯৭৭ সালে। স্তালিনের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় "সমাজতন্ত্রের ভিত (আসনোভি সোৎসিয়ালিজমা)" রচনার অভিজ্ঞতা। স্তালিনের হাতে পোঁতা সমাজতন্ত্রের চারাগাছটি বিগত চার দশকে কি ভাবে ডালপালা মেলে বৃক্ষে পরিণত হয়েছে, তা বোঝাতেই সুসলভ সামনে নিয়ে আসেন "ম্যাচিওর সোশালিজমের" তত্ব। পলিটিক্যাল ইকোনমির ক্লাশে শিক্ষক যখন এটি ব্যাখ্যা করতেন, তখনকার জ্ঞানের পরিধিতে সব কিছু সঠিক মনে হত। কিন্তু এর ভেতর ফাঁক ছিল, যেমন পরিপক্ক সমাজতন্ত্রকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য দেশের নতুন প্রজন্মের আশা আকাঙ্খা কে ধারণ করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিচালনা যুগোপযোগী করা এবং দেশ পরিচালনায় জনগণের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা।

"ম্যাচিওর সোশালিজম" তত্বের ছয়টি মূল ধারণা ছিল। এর একটি ছিল "আমাদের এমন একটি সমাজ যেখানে রয়েছে প্রকৃত গণতন্ত্র এবং এর রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করে ফলপ্রদ জনশাসন, সুগম করে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে শ্রমজীবি জনগণের বর্ধিত অংশগ্রহণ;এবং নাগরিকদের সমাজের প্রতি যার যার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনকে যুক্ত করে তাদের প্রকৃত অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহের সঙ্গে" । এর প্রায় পুরোটাই ফাঁকা বুলি ও অন্তঃসারশূন্য। "প্রকৃত গণতন্ত্র" চর্চা বাস্তবে ছিল নিয়ন্ত্রিত, যার কাঠামোগত নাম "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ (দেমোক্রাতিচেস্কি ৎসেন্ত্রালিজাম)", অর্থাৎ ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া নির্দেশনা, সিদ্ধান্ত লোক দেখানো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে মেনে নেয়া। আরো স্পষ্ট করলে ডেমোক্রাটিক সেন্ট্রালিজম ছিল গণতন্ত্রের মোড়কে কমিউনিস্ট পার্টির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনকে বৈধতা দেয়া।

এই ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম কনসেপ্টটি ছিল অক্টোবর বিপ্লবের মূল চেতনার পরিপন্থী । ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি ক্ষমতা দখল করলেও বিপ্লবের অন্যতম শ্লোগান ছিল "সব ক্ষমতা সোভিয়েতের (ভেসয়া ভ্লাস্ত সোভিয়েতাম)"। সোভিয়েতের অর্থ "কাউন্সিল", বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় শ্রমিক, কৃষক ও নৌসেনাদের (যারা অক্টোবর বিপ্লব সাধন করেছিল)

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে গঠিত শাসন পরিচালনার জন্য আইনসভা। লেনিন তাঁর সময়ে বলশেভিক পার্টিকে সরাসরি রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ থেকে দূরে রেখেছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার বলয় থেকে উদ্ভুত নানাবিধ কলুষ থেকে পার্টির নেতা কর্মীদের দূরে রাখা। পার্টির দায়িত্ব ছিল আদর্শিক গাইডেন্স দেয়া। সোভিয়েতের নির্বাচন হত জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ভোট দানের মাধ্যমে। কমিউনিস্ট পার্টি যাতে সোভিয়েতের নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে না পারে, তার রক্ষা কবচ রাখা হয়েছিল ১৯১৮ সালের সংবিধানে। একদলীয় শাসন ব্যবস্থার ভেতরেও যে জনগণের অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র বহাল রাখা যেতে পারে তার পথ লেনিন দেখিয়েছিলেন।

লেনিনের মৃত্যুর পর যখন স্তালিন ক্ষমতায় আসেন তখন থেকে পরোক্ষভাবে সোভিয়েতের নির্বাচনগুলোয় ক্ষমতাশীন কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ১৯৩৬ সালের সংবিধানে স্তালিন রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশাসনিক কর্মকান্ডে ক্ষমতাশীন দলকে সীমিত ভূমিকা রাখার একটি ধারা যোগ করেন। স্তালিনের আমলে পার্টির হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও সোভিয়েতের নির্বাচনগুলো ছিল জনগণের অংশীদারিত্বমূলক। লেনিন-স্তালিন যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাগ্য যখন দ্বিতীয় প্রজন্মের নেতাদের হাতে বর্তায়, তখন থেকে সোভিয়েতের নির্বাচনগুলোর প্রহসনে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। "পরিপক্ক সমাজতন্ত্রের" সমর্থনে পার্টির তাত্ত্বিক গুরু মিখাইল সুসলভ আরো একটি নতুন নৃতাত্ত্বিক প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন। ১৯৭৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই মার্চ মস্কোর ক্রেমলিন কংগ্রেস প্রাসাদে অত্যন্ত জাকঁজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির স্মরণকালের সবচেয়ে বড় ২৫তম কংগ্রেসে ঘোষণা দেন সোভিয়েত সমাজ জাতি গঠনের পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করেছে। বহুজাতিক রাষ্ট্রে (সোভিয়েত রাষ্ট্রে বড় ও ক্ষুদ্র মিলিয়ে বসবাস ছিল একশোর ও বেশি জাতি ও জাতিসত্তার) দেশের জাতিসত্তাগুলোর পরিচয় বিলীন হয়ে যাচ্ছে এবং তার জায়গায় উঠে আসছে একটি কম্পোজিট জাতিগত পরিচয় - সোভিয়েত জাতি (সোভিয়েতস্কি নারোদ)। এটি ছিল আরো অবাস্তব। তার প্রমান মেলে সোভিয়েত রাষ্ট্র ভেংগে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উবে যায় "সোভিয়েত জাতি" এবং অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রগুলোর অনেকে নিজেদের মাঝে নানা ইস্যুতে সংঘাত ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, যার জের এখনো চলছে ইউক্রেনের দনবাস এলাকায়। রুশ জনগণের বিশাল আত্মত্যাগ, সাহায্য ও সহমর্মিতার বদৌলতে সাবেক রুশ সাম্রাজ্যের পিছিয়ে পড়া সামন্ত যুগে আটকে থাকা যে সব জাতিসত্তা তর তর করে আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে, নব্য স্বাধীনতা পেয়ে এরাও উঠে পড়ে লেগে যায় তাদের জীবনযাত্রা থেকে রুশ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সব চিহ্ন মুছে ফেলতে। পাশের বাড়ীর রুশরা রাতারাতি বনে যায় বিদেশী, পরিণত হয় সাময়িক অতিথিতে এবং শুরু হয় অপেক্ষার কখন এরা এদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, অনেকটা ১৯৪৭-পরবর্তী বিভাজিত সাবেক বৃটিশ ভারতীয় ভূখন্ডের মত।

সুসলভের এই অনুমানগুলো ছিল মূলতঃ আসপিরেশানাল, অনেক অনেক দূর ভবিষ্যতের অভীষ্ট। কিন্তু এই অভীষ্ট কোন একদিন অর্জন হয়তো সম্ভব হতো যদি ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির সোভিয়েত সমাজের যে কাল্পনিক চিত্র সুসলভ এঁকেছিলেন, তার পরিবর্তে সমকালীন সমাজের সত্যিকারের চেহারাটি তুলে ধরার সাহস দেখাতেন এবং অর্থবহ যন্ত্রনাদায়ক পরিবর্তনের পথ ধরতেন। মধ্য-সত্তুর দশকে পরিবর্তন ছিল খুবই জরুরী, সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য বলতে গেলে ক্রাঞ্চ-টাইম। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতির দূর্বলতাগুলো স্পষ্ট হতে থাকে। এর প্রকাশ ঘটে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ হয়ে যাওয়ায় এবং জনসাধারণের চাহিদা মেটানোর জন্য পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও গুণগত মান পর্যাপ্ত না হওয়ায়। নেতারা না দেখার ভান করতেন যে ততদিনে সোভিয়েত ক্রেতারাও "কনজুমারে" রূপান্তরিত হয়েছেন। এ সময় পার্টি নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়ার, দরকার ছিল দীর্ঘমেয়াদে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গঠন ও ব্যবস্থাপনায় যুগোপযোগী সংস্কারের জন্য ধারাবাহিক কার্যক্রম গ্রহণ করা। যেহেতু কার্ল মার্কস সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্মাণের কোন ব্লুপ্রিন্ট রেখে যান নি, তাই বিপ্লবের স্বপ্নভূমি হওয়ায় সোভিয়েত দেশের ওপরেই বর্তে ছিল দায়িত্ব - পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকল্প হিসেবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার জগত থেকে প্রয়োগের বাস্তবভূমিতে নিয়ে আসা।

প্রথম চেষ্টা, পরিকল্পিত অর্থনীতি ম্যাজিকের মত করেছে বিপ্লবের পর ত্রিশ দশকে সমাজতন্ত্র বিনির্মানের যুগে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সময়, যে সময়টিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন ইওসিফ ভিসসারিওনোভিচ স্তালিন। নিজে রুশ ছিলেন না, ছিলেন জর্জিয়ান। কিন্তু তার মত করে খুব কম রুশই তাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সভ্যতাকে ভালবেসেছে এবং তাদের দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। মৃত্যুর পর পরবর্তী-সোভিয়েত নেতৃত্ব তার সব লিগেসি মুছে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বীরনগরী স্তালিনগ্রাদের নাম পাল্টে রাখা হয় ভল্গাগ্রাদ। স্তালিনকে নিয়ে বেশি কিছু বলা প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আমরা টিচারদের স্তালিন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা অস্বস্তিবোধ করতেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর স্তালিন আখ্যায়িত হতে থাকেন "বাচার", "নরখাদক" ইত্যাদি হিসেবে। এত কিছুর পরও রুশ জনগণের ঐতিহাসিক স্মৃতি থেকে তাকে

মুছে ফেলা সম্ভব হয় নি, বরং তার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের জনমত জরিপগুলোতে স্তালিনের জনপ্রিয়তা শীর্ষে, নতুন করে নির্মিত হচ্ছে তার স্মৃতিস্তম্ভ। বর্তমান রুশ রাষ্ট্রও স্তালিন চর্চায় কোন বাধার সৃষ্টি করছে না।

স্তালিনের সময়ে পরিকল্পিত অর্থনীতির মূল শর্তগুলো মানা হয়েছে কড়াকড়িভাবে। উৎপাদন ইউনিটগুলোর পণ্য ও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরি করা হত দেশ ও জনগণের চাহিদার দিকে খেয়াল রেখে। কলকারখানা ও অন্যান্য শিল্প ইউনিটগুলোর ম্যানেজারদের জবাবদিহিতা ছিল সুশৃঙ্খল। প্লান যে কোন মূল্যে পূরণ করতে হত (রুশ ভাষায় "নিউকাসনিতেলনা"), না করতে পারলে ম্যানেজারদের ওপর নেমে আসত খড়গ। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় এই সুশৃঙ্খল জবাবদিহিতা পরবর্তীতে পরিচিতি পায় "কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল" হিসেবে, যার জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতি বাইরের দুনিয়ায় পরিচিতি লাভ করে "আদেশ ও নিয়ন্ত্রণমূলক" অর্থনীতিতে। স্তালিনের পরিকল্পিত অর্থনীতির দুটি মূল স্তম্ভ ঔপনিবেশিক শাসনের নিগড় থেকে মুক্ত তৃতীয় বিশ্বের অনেক সদ্য-স্বাধীন দেশ গ্রহণ করেছে। একটি হল "প্যাতিলেতকা (পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা),"অন্যটি "গসপ্লান" (স্টেট প্লানিং এজেন্সি বা পরিকল্পনা কমিশন)। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী (১৯২৮-১৯৩২) পরিকল্পনার অধীনে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের সূচনা ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশটি এখন আর নেই, বিশ্বের প্রায় সব জায়গায় বাজার অর্থনীতির দাপট, কনসেপ্ট হিসেবে পরিকল্পিত অর্থনীতি অবহেলিত। তবু ও অনেক দেশ এখনো মহাধূমধামে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করে, তাদের সব অর্জন ও সাফল্যকে এই পরিকল্পনার আলোকে প্রতিফলিত করে, বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদদের দ্বারা সজ্জিত প্লানিং কমিশন নানা বিষয়ে বিশ-পঞ্চাশ বছরের দূরবর্তি ভিশন-পরিকল্পনা তৈরি করে চলছে। স্তালিনের মৃত্যুর পর নতুন নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ কমান্ড ও কন্ট্রোল ব্যবস্থা শিথিল করে দেন; এতে দূর্বল হয়ে পড়ে জবাবদিহিতা এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির গতিশীলতা মুখ থুবড়ে পড়ে। শুরু হয় অন্য নামে বাজার অর্থনীতির কিছু কিছু পদ্ধতি চালু করা, যেমন শ্রম থেকে অর্জিত আয়কে পারফরমেন্সের সঙ্গে যোগ করা, যার নাম দেয়া হয় ম্যাটেরিয়াল ইনসেন্টিভাইজেশন অব লেবার (মাতেরিয়ালনায়ে স্তিমুলিরাভানিয়ে ত্রুদা)। অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রায়ন, বাজার অর্থনীতি-ভিত্তিক কিছু প্রণোদনা চালুর চেষ্টা, কৃষি খাতে কিছু সীমিত সংস্কার করা হয়। পরে এ সব সংস্কার থেকে পিছু হটে আসেন ক্রুশ্চেভ। এ ভাবেই ক্রুশ্চেভ থেকে ব্রেজনেভ পর্যন্ত সব সোভিয়েত নেতা চেষ্টা করেছেন কমান্ড ও কন্ট্রোল শিথিল করে বাজার অর্থনীতি-ভিত্তিক সীমিত কিছু সীমিত প্রণোদনা ঢুকিয়ে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করার জন্য। কিন্তু এ সব কোন প্রচেষ্টাই সাফল্যের মুখ দেখে নি।

যে সময়টিতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ভীরুতা ও দোদুল্যমানতার পরিচয় দিয়েছে, ঠিক সে সময় সাহস আর দৃঢ়চিত্ত নিয়ে এগিয়ে আসে, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব। দুই প্রতিবেশী (এককালে স্তালিন-পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র) নিজেদের মাঝে আদর্শিক মতবিরোধ এবং এ থেকে উদ্ভুত বৈরিতা (যা আমেরিকা সুকৌশলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘায়েল করার কাজে ব্যবহার করেছে) সত্ত্বেও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও গনচীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও সে তুং এর মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরি দেং শিয়াও পিং শক্ত হাতে পার্টির হাল ধরেন ও অর্থনীতির যুগোপযোগী সংস্কার সাধনে অবতীর্ণ হন। না করে কোন উপায় ছিল না। মধ্য-সত্তুরে সমাজতান্ত্রিক মডেলের পরিকল্পিত অর্থনীতির দূর্বলতাগুলো প্রকট হতে থাকে, স্লোগানবাজি করে যা ঢেকে রাখা সম্ভব ছিল না।

কৃষি খাত দিয়ে চীনে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের "কালখোজের" আদলে গড়া কমিউন-ভিত্তিক যৌথ খামারগুলো ভেঙ্গে প্রচলন করা হয় কৃষক পরিবার-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা। কৃষি জমি সামাজিক মালিকানায় থাকলেও তা দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারের জন্য কৃষকদের লিজ দেয়া হয় এই শর্তে যে, উৎপাদনের রাষ্ট্র-নির্ধারিত কোটা পূরণ করতে পারলে উদ্বৃত্ত বিনা বাধায় বাজার মূল্যে খোলা বাজারে বিক্রী করা যাবে। কৃষি খাতে গণচীনের এই এক্সপেরিমেন্ট সাফল্যের মুখ দেখে এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। একদিন পলিটিক্যাল ইকোনমির ক্লাসে টিচারকে চীনের কৃষি খাতে শুরু হওয়া এই রিফর্মগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি মন খারাপ করে বলেছিলেন এটি সংশোধনবাদ, চীনে পূঁজিবাদের বিকাশ ঘটাবে এবং সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ডেকে আনবে। তখন তার কল্পনারও অতীত ছিল সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় চীনে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নে ঘটবে; শুধু কি তাই, তার সাথে সাথে দেশটিও ধ্বংস হয়ে যাবে। চীনে পূজিঁবাদের বিকাশ ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে সমাজতন্ত্রও ঠিকে আছে ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির একচ্ছত্র শাসনে। আর চীনের পূজিঁবাদ ও খোলা বাজারের পূঁজিবাদ নয়, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনে সেখানে পূজিঁবাদের বিকাশ ঘটছে এবং এই পূঁজিবাদের চরিত্রও আলাদা। তবে সত্যের খাতিরে বলা প্রয়োজন, চীনের চমকপ্রদ সাফল্য সবটুকু নিজেদের অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের জন্য নয়; এর পেছনে প্রভাবকের মত কাজ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের উজাড় করে দেয়া নৈতিক ও বৈষয়িক সহযোগিতা: পূজিঁ বিনিয়োগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চীনের অন্তর্ভুক্তির পথ সুগম করে দেয়া, নিরাপত্তা পরিষদে চীনের সদস্যপদ তাইওয়ানের কাছ থেকে কেড়ে তা গনচীনকে দেয়া।

সময় খুব দ্রুত কেটে যায়। আমরা পা দেই নতুন ১৯৮০-র দশকে, থার্ড ইয়ারের মাঝামাঝি, কোর্সের অর্ধেক শেষ। জুলাই মাসে পরীক্ষাগুলো শেষ হয়ে যায়। এ সময় মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস। সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৭৯-র ডিসেম্বরে আফগানিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে পাশ্চাত্যের দেশগুলো মস্কো অলিম্পিক বর্জন করে। গ্রীষ্মের ছুটিতে চার বছর পর বাংলাদেশে আসি, পুরো সময় কাটে বাবা, মা, ভাইবোনদের সঙ্গে ধরমপাশা গ্রামের বাড়ীতে। এর মধ্যে ঘটেছে অনেক পরিবর্তন। ছোট বোন সাধনার বিয়ে হয়ে গেছে। জন্ম হয়েছে বড় ছেলের, ওর নাম রাখি পাভেল (রুশ নাম)। প্রথম যখন কোলে নেই ওর বয়স এক বছরের ও কম। ১৯৭৯-তে বিয়ে করে আমার বড়দাও। নতুন বৌদিকে দেখে মুগ্ধ হই; দাদা-বৌদির সঙ্গে ঠাকুরাকোণায় তার শ্বশুরবাড়ীতে বেড়াতে আসি। বৌদির বড় ভাই হাস্যোজ্জ্বল, প্রাণবন্ত মনুদার (স্বর্গীয় মনোরঞ্জন সিংহ) সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাকে খুবই মিস করি। (তার সঙ্গে আমার সর্বশেষ দেখা হয় ২০১৪ সালে মধুপুর আমার শ্বশুড়বাড়ীতে, যখন আমি এফএও-র আন্তর্জাতিক পরামর্শক হিসেবে জুলাই-সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে আসি।) স্কুলের সহপাঠী অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়। মোস্তাক এ সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা, তুখোড় বক্তা ও তার্কিক। একদিন টিভিতে ওর বিতর্ক উপভোগ করি। ছুটি শেষ হয়ে যায়, একরাশ নতুন স্মৃতি নিয়ে আবার ফিরে আসি ক্রাসনাদার।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়: চতুর্থবর্ষে অধ্যয়ন

১৯৮০-র সেপ্টেম্বরে আমরা ফোর্থ ইয়ারে উঠে যাই। আমরা আসার পর এ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে কোন ছাত্রছাত্রী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে নি। আমিন ভাই এসেছেন কুবান রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। খুব সম্ভব ১৯৮০-র শেষ দিকে এলেন ওপার বাংলার বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের তরুণ অধ্যাপক ডঃ দীপঙ্কর সাহা। তিনি এসেছেন সয়েল সায়েন্সে পোস্ট-ডক করতে। দাদাকে সোভিয়েত সিস্টেমে ঢোকাতে আমরা তৎপর হয়ে উঠি। দাদা তার বিষয়ে ছিলেন পন্ডিত মানুষ। আমরা অবাক হয়ে যাই যখন তার মুখে শুনতে পাই দকুচায়েভের নাম, কারণ স্নায়ুযুদ্ধ পশ্চিমা দুনিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির লেনদেনে এক ধরনের দেয়াল সৃষ্টি করেছিল। প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী ভ্যাসিলি দকুচায়েভকে আধুনিক মৃত্তিকা বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তিনি মৃত্তিকা গঠনে ভূতাত্বিক উপাদান সমূহের অবদান, মৃত্তিকার গঠন, মৃত্তিকার শ্রেণীবিন্যাস, মৃত্তিকার ভৌগলিক ম্যাপ তৈরি এ সব বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করেছেন। সেকেন্ড ইয়ারে আমরা দকুচায়েভের মৃত্তিকা শ্রেণীবিন্যাস পড়েছি। জর্জিয়ার সুখুমিতে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের ফিল্ড প্রাকটিক্যালের সময় পাহাড়ে গভীর গর্ত খুড়েঁ মাটির দেয়ালের নমুনা সংগ্রহ করে মৃত্তিকা গঠনের বিভিন্ন স্তরগুলো শনাক্ত করেছি। এ সব তথ্য উপাত্ত নিয়ে একটি গবেষণামূলক রিপোর্টও (কোর্স ওয়ার্ক) তৈরি করেছি। দাদাকে আমরা নিয়ে গেলাম মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে এবং পরিচয় করিয়ে দিলাম বিভাগীয় প্রধান ম্যাডামের সংগে। তিনি কি নিয়ে গবেষণা করবেন, এটি আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। তার মূল চ্যালেঞ্জ ছিল রুশ ভাষা শেখা, ভর্তি হয়ে যান রুশ ভাষার ক্লাসে।

চতুর্থ বর্ষে আমাদের পাঠ্যক্রমে নতুন যোগ হওয়া বিষয়গুলোর মাঝে ছিল - উদ্ভিদ প্রজনন ও বীজ উৎপাদন (সিলেকৎসিয়া ই সিমেনাভোদস্তভো); ফিল্ড এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন; পরিসংখ্যান; কৃষি অর্থনীতি; কৃষি উৎপাদন সংগঠন, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা (সাপ্লাই চেইন ডেভেলপমেন্টের সমতুল্য); শ্রমের নিরাপত্তা (ওয়ার্কপ্লেস সেফটি)। সোশাল সায়েন্সে নতুন যে বিষয়টি যোগ হয় তার নাম বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ (সায়েন্টিফিক কমিউনিজম), এর মূল বিষয়বস্তু ছিল মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিহীন সমাজ গঠনের রূপকল্প, পরিপক্ক সমাজতন্ত্র কি ভাবে বিবর্তনের ধারায় (তখন আর বিপ্লবের কথা বলা হত না) শ্রেণীবিহীন সমাজে রূপান্তরিত হবে তার স্ট্রাটেজিক ভিশন। পাশ্চাত্যের সমাজ তখন প্রস্তুত হচ্ছে শিল্পায়নের যুগ থেকে উত্তর-শিল্পায়ন যুগে প্রবেশ করার জন্য। এর কারণে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জগুলোর উদ্ভব ঘটে, তা সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। কারণ সাম্যবাদের মূল ধারণা ছিল "প্রত্যেকের কাছ থেকে যার যা সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেকের জন্য তার তার চাহিদা অনুযায়ী (From each according to his/her ability, to each according to his/her needs) ।

এর বিপরীতে সমাজতন্ত্রের মূল ধারণা ছিল "প্রত্যেকের কাছ থেকে যার যা সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেকের জন্য তার তার শ্রম অনুযায়ী" From each according to his/her ability, to each according to his/her needs) ।শ্রম আর সামর্থ্যের মাঝে ভারসাম্য টিকিয়ে রাখতে যখন সোভিয়েত অর্থনীতি হিমশিম খাচ্ছে, তখন প্রাপ্যকে চাহিদার সঙ্গে যোগ করলে পণ্যসামগ্রী ও

নাগরিক সেবার পরিমান ও গুণগত মান যে পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন এবং তার জন্য যে কাঠামোগত সংস্কার ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জগুলো ছিল তা মোকাবেলায় তৎকালীন সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতি ধারেকাছেও ছিল না। পার্থক্য এতই গভীর ছিল যে, সব শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটিয়ে শ্রেণীবিহীন ও সমান সাম্যবাদী সমাজ গঠন অলীক স্বপ্নের মতই ছিল। খুব কম লোকই বিশ্বাস করতো এ ধরনের সমাজ নির্মাণ আদৌ কোনদিন সম্ভব হবে।
এ সব বিষয়গুলোকে পাশ কাটিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকতো মুখস্থ বুলিতে পরিণত হওয়া তত্ত্বের ওপর। পার্টির প্রতি মানুষের আস্থায় চিড় ধরতে শুরু করে। সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের যুগের অন্যতম শ্লোগান, "পার্তিয়া ই নারোদ ইদিনি (পার্টি ও জনগণ এক), তার আবেদন হারিয়ে ফেলে।"বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের পাশাপাশি আরো তিনটি বই আমাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়: লিটল ল্যান্ড (মালায়া জিমল্যায়া), ভার্জিন ল্যান্ড (ৎসেলিনা), ও রিকনস্ট্রাকশন (ভাজরাঝদেনিয়ে)। এ বইগুলোর গ্রন্থকার ছিলেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান লিওনিদ ইলিচ ব্রেঝনেভ। কিন্তু জনমনে প্রবল বিশ্বাস ছিল বইগুলো তিনি লিখেন নি, অন্য কেউ তার হয়ে লিখে দিয়েছে। এর কারণ ততদিনে সোভিয়েত রাজনীতিকে প্রবলভাবে গ্রাস করেছে তোষামোদ, যার মূলে ছিল শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারাদের পার্টি থেকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সুবিধাবাদী, সুযোগসন্ধানী ও আমলাদের প্রভাবাধীন পার্টিতে রূপান্তর।

আমলাদের প্রভাব বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল নেতা লিওনিদ ব্রেঝনেভের শারীরিক অসুস্থতা, যার সূত্রপাত তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের গোড়ার দিকে এবং ধীরে ধীরে জমতে শুরু করে। কারণ স্তালিন তার উপুর্যপুরি অনুরোধ সত্ত্বেও দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা ও নিরাময়ের জন্য ছুটি অনুমোদন করেন নি। যদিও ১৯৬৪ সালে ব্রেঝনেভকে মনে হত যৌবনোদীপ্ত ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, মধ্য-সত্তুরে তার কর্মশক্তি হ্রাস পেতে শুরু করে এবং তিনি যে সুস্থ নন তা দৃশ্যমান হতে শুরু করে। এ সময় তার দৈনন্দিন দাপ্তরিক ও রাষ্ট্রাচার-সম্পর্কিত কর্মকান্ডের শিডিউল বজায় রাখতে তিনি হিমশিম খেতে শুরু করেন। এটি কিছু নেতৃস্থানীয় পার্টি আমলাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় ব্রেঝনেভের গভর্নেন্স এজেন্ডা ও রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে। এই আমলাচক্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ সংহত করার উদ্দেশ্যে স্তালিনের মত ব্রেঝনেভেরও স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি (পারসোনেলিটি কাল্ট) গড়ে তুলতে শুরু করে।

লিওনিদ ব্রেঝনেভকে ঘিরে রাখা তোষামোদকারীদের প্রভাব বাড়তেই থাকে। তৎকালীন সোভিয়েত নেতাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেয়া সম্মানসূচক পিএইচডি বা ডি লিট ডিগ্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। তাদের নজর থাকতো পুরষ্কার, খেতাব, উপাধি এসবের দিকে। ট্রিলোজি প্রকাশ হয়ে যাবার পর লিওনিদ ব্রেঝনেভকে সাহিত্যে অবদানের জন্য সর্বোচ্চ স্বীকৃতি লেনিন পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়। এর আগে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮১ সালের মাঝে তাকে তিন বার সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব "সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর (গেরই সোভিয়েতস্কাভা সাইয়ুজা)" প্রদান করা হয়। এটি ছিল অভূতপূর্ব। কারণ লিওনিদ ব্রেঝনেভ কোন ফিল্ড কমান্ডার ছিলেন না। তিনি ছিলেন আর্মির রাজনৈতিক বিভাগে। কাজ ছিল সেনাবাহিনীর ভেতর দলের আদর্শিক প্রচারণা ও সেনাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেয়া। পক্ষান্তরে সত্যিকারের বীর, জননন্দিত লিজেন্ডারী সেনানায়ক ও জার্মান বাহিনীর ত্রাস, মার্শাল গিওর্গি ঝুকভ, যিনি মস্কো, স্তালিনগ্রাদ, কুর্স্ক ও বার্লিন সহ দেশের ভাগ্য নির্ধারণকারী গুরুত্বপূর্ণ রনাঙ্গনগুলোতে সামনে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, তাকে "সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর" খেতাব দেয়া হয়েছিল চারবার। এভাবেই তোষামোদের কাছে হেরে যায় সব প্রথা ও কনভেশন।

১৯৭০-র শেষ দিকে লিওনিদ ব্রেঝনেভ এতই দূর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তার হেটেঁ আসতে কষ্ট হত। টিভিতে দেখতাম ঠিক তার পেছনে সতর্ক হয়ে হাঁটছেন দীর্ঘদেহী পররাষ্ট্র মন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো ও প্রধান মন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিন। মঞ্চে উঠার সময় তিনি সহকর্মীদের হাত ধরতেন, কোটের পকেট থেকে লিখিত বক্তব্য বের করে ভাঁজ খোলার সময় হাত কাঁপত, শব্দ উচ্চারণে থাকত জড়তা ও অসংলগ্নতা। নেতার ভঙ্গুর মন ও অবনতিশীল স্বাস্থ্যের সুযোগ নিয়ে ঘিরে রাখা তোষামোদকারী চক্র রাষ্ট্রের সত্যিকারের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের করায়ত্ত করে এবং এভাবেই পার্টি-প্রশাসন একাকার হয়ে যাওয়া আমলাচক্রের ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও সর্বোপরি বিপ্লবের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রটি পরিণত হয় আমলাচালিত রাষ্ট্রে। সর্বহারারার একনায়কত্ব কায়েম করে যাত্রা শুরু করা সোভিয়েত রাষ্ট্রটি কর্তৃত্বপরায়ণ হলেও তা ছিল জনসম্পৃক্ত; বলশেভিক পার্টি তখন সত্যি ছিল শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারাদের দল। তারা দেশ শাসনে তৃণমূল জনগণকে সুযোগ দিয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের সোভিয়েতগুলোতে (কাউন্সিল) ভোট প্রদান করে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে। কালের বিবর্তনে সোভিয়েতগুলোর ক্ষমতা খর্ব করে দেয়া হয়; নির্বাচন ব্যবস্থাকে হাস্যাস্পদ করে দেয়া হয় মানুষের সত্যিকারের ভোটাধিকার হরণ করে।

লিওনিদ ব্রেঝনেভের শাসনামলে দেশের জনসংখ্যা ছিল ২৭৬ মিলিয়ন আর আমলার সংখ্যা ছিল ১.৭৫ মিলিয়ন। অর্থাৎ প্রতি ১৫৮ জন মানুষের জন্য একজন করে আমলা। কারা ছিল এই আমলা ? আমলাগোষ্টির শীর্ষে ছিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রাণভোমরা। ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় কমিটিতে মোট আমলার সংখ্যা ছিল ২২,৫০০; এর পর ছিল প্রশাসনিক আমলা ও পরিকল্পিত অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক আমলাগোষ্টি। এবং বিস্ময়কর শোনালেও সত্য এই আমলারা ছিল ভিআইপি। গড় মানুষের জন্য বিনামূল্যে সাধারণ মানের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল তা থেকে ভিআইপিদের জন্য উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য ছিল মস্কোতে বিশেষায়িত ক্লিনিক। সাধারণ মানুষ যখন উন্নত মানের ভোগ্য পণ্য এবং বিলাসী দ্রব্য কেনার জন্য ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে লাইনে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করত, তখন এসব সামগ্রী এদের সরবরাহের জন্য ছিল আলাদা সাপ্লাই চেন, ঘরে বসে অনায়াসে এসব জিনিস এরা পেয়ে যেত। মুখে সমতা ও সাম্যের ঢাকঢোল পিটানো হলেও সোভিয়েত সমাজ নানাভাবেই হয়ে পড়েছিল ডিফারেনশিয়েটেড। তাই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনের সঙ্গে সত্যিকারের জনসম্পৃক্ততা ছিল সামান্যই।

তবে সত্যের খাতিরে বলতে হয় কৌতুক করলেও সাধারণ মানুষ লিওনিদ ব্রেঝনেভকে ভালবাসত; স্তালিনের পর তিনি ছিলেন সবচেয়ে জননন্দিত নেতা। তার ১৮ বছরের শাসনকালে তিনি বড় ধরনের কোন কাঠামোগত সংস্কার, যা চীন মধ্য-সত্তুর দশক থেকে শুরু করে, এড়িয়ে গেছেন নতুন কোন সামাজিক অসন্তোষ সৃষ্টির ঝুঁকি থেকে। তার শাসনামলে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি দ্রুত ঘটে নি। কিন্তু তিনি উপহার দিয়েছিলেন স্থিতিশীলতা, যা সোভিয়েত জনগণের পরম কাম্য ছিল। জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য তার বই লেখার কিংবা অসংখ্য খেতাব নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি খপ্পরে পড়ে যান মানুষের আদিম প্রবৃত্তির, যার প্রতি বিভিন্ন মাত্রায় সংবেদনশীল নন, এমন মানুষ পৃথিবীতে কমই আছেন। দূর্ভাগ্যক্রমে একবার যদি চাটুকারের দল ঘিরে ফেলে ও অবিরাম কর্ণকুহরে স্তুতিবাক্য বর্ষণ করে "লারজার-দেন-লাইফ" প্রতিবিম্বটি চোখের সামনে হাজির করে, তাহলে সেই পিচ্ছিল পথ থেকে হটে আসা কঠিন। এটি ছিল "পরিপক্ক সমাজতন্ত্রের" মুখ-ফুটে-না-বলতে-পারা মুদ্রার ওপর পিঠের এক বাস্তবতা।
ছাত্রজীবনে এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাই নি, যতটুকু ঘামিয়েছি তা পরীক্ষায় উতরে যাবার জন্য। সমাজের অসংগতিগুলো সোভিয়েত নাগরিকদের মত আমরাও উপভোগ করেছি। সাধারণ ধারণা ছিল নতুন নেতৃত্ব ওঠে আসলে এগুলো শুধরে যাবে। আজ সোভিয়েত রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে কারণ খুঁজতে গিয়ে এসব বিষয়কে নতুন আলোকে দেখতে হচ্ছে।

চতুর্থ বর্ষেই মোটামুটি ঠিক হয়ে যায় কোন বিষয়ে স্পেশালাইজড হব। আমার ভাল লাগত প্লান্ট ব্রিডিং (উদ্ভিদ প্রজনন), যার বিষয়বস্তু শস্যের নতুন জাত উদ্ভাবন। এটি পড়াতেন ম্যাডাম অধ্যাপক ভালেনন্তিনা ভাসিলিয়েভনা এফরেমভা। এর আগের বছর তিনি পড়িয়েছেন কৌলিতত্ব। তিনি খুবই সুন্দর করে পড়াতেন যে কারণে জেনেটিক্স ও প্লান্ট ব্রিডিং এর প্রতি আসক্তি জন্মায়। আগের বছরে আমরা পড়েছি রাজনৈতিক অর্থনীতি, যেটি মূলতঃ ছিল অর্থনীতি নিয়ে দার্শনিক চিন্তাভাবনা। এ বছরে শুরু হয় কৃষি অর্থনীতি যা ছিল ক্লোজ-টু-লাইফ। যদিও পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল ধারণাগুলো ছিল শুধুই আমাদের জানার জন্য যেমন পুঁজি, বাজার, চাহিদা, সরবরাহ; কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের সঙ্গে জড়িত ধারণা, যেমন উৎপাদন খরচ, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য, মোট/নিট আয়, লাভ, ক্ষতি, লাভ-খরচের অনুপাত এগুলো একই রকমের ছিল। কৃষি ফার্ম ম্যানেজমেন্টের অংশ হিসেবে আমাদের তৈরি করতে হয়েছে টেকনোলজিক্যাল ম্যাপ (তেখনোলগিচেস্কায়া কার্তা)। এটি ছিল কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপকে শনাক্ত করে সেখানে কি কি প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহার করা হয় তার তালিকা ও খরচ নির্নয়, কোথায় কোথায় কি পরিমান ক্ষতি হয় তা খতিয়ে দেখা, উৎপাদনের লাভজনকতা মূল্যায়ন করা। এটি অনেকটা ভ্যালু চেইন এনালাইসিসের মত ছিল। লেবার প্রটেকশন (আখ্রানা ত্রুদা) কোর্সটি মূলতঃ ছিল ওয়ার্কপ্লেস সেফটি এন্ড অকুপেশনাল হেলথ সম্পর্কিত। কৃষি উৎপাদন সংগঠন, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কোর্সটিকে তুলনা করা যেতে পারে সাপ্লাই চেইন ডেভেলপমেন্টর সংগে। পরিকল্পিত অর্থনীতি স্তালিনের সময়ে চমকপ্রদ ফল দেয়ার অন্যতম কারণ এর ফাঁকবিহীন, সুশৃঙ্খল ও জবাবদিহিমূলক সাপ্লাই চেইন।

শীতকালীন সিমেস্টার দ্রুত সমাপ্তির দিকে ধাবিত হয়। একমাত্র দীপঙ্কর দা ছাড়া নতুন আর কেউ ছিল না। এসে যায় বহুপ্রতীক্ষিত নববর্ষের প্রাক্কাল। সেই একই ঐতিহ্য। হামিদ ভাই/ সুবাসদার রুমে নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান। শুরু হয় আবারো সেই জনপ্রিয় টেলিফিল্ম "ভাগ্যের পরিহাস (ইরোনিয়া সুদবি)" দেখে। পূর্বে এই ফিল্মটির কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছি। এবার এর একটি জননন্দিত গানের অনুবাদ করেছি

Я спросил у ясеня,
Где моя любимая.
Ясень не ответил мне,
Качая головой.
Я спросил у тополя,
Где моя любимая.
Тополь забросал меня
Осеннею листвой.
Я спросил у осени,
Где моя любимая.
Осень мне ответила
Проливным дождем.
У дождя я спрашивал,
Где моя любимая.
Долго дождик слезы лил
За моим окном.
Я спросил у месяца,
Где моя любимая.
Месяц скрылся в облаке,
Не ответил мне.
Я спросил у облака,
Где моя любимая.
Облако растаяло
В небесной синеве.
Друг ты мой единственный,

Где моя любимая.
Ты скажи, где скрылась,
Знаешь, где она.
Друг ответил преданный,
Друг ответил искренний:
Была тебе любимая,
Была тебе любимая,
Была тебе любимая,
А стала мне жена

আমি অ্যাশ গাছকে জিজ্ঞেস করলাম,
কোথায় আমার প্রিয়তমা।
অ্যাশ উত্তর না দিয়ে,
মাথা নাড়াল।

আমি পপলার গাছকে জিজ্ঞেস করলাম
কোথায় আমার প্রিয়তমা
পপলার আমার দিকে ছুঁড়ে দিল
শরতের লতাপাতা

আমি শরতকেজিজ্ঞেস করলাম
কোথায় আমার প্রিয়তমা
শরত আমাকে উত্তর দিল
অঝোর বৃষ্টি নামিয়ে

আমি বৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করলাম
কোথায় আমার প্রিয়তমা
বৃষ্টি অনেকক্ষণ অশ্রু ঝরা
আমি চাঁদকে জিজ্ঞেস করলাম

কোথায় আমার প্রিয়তমা
চাঁদ মুখ লুকোল মেঘের আড়ালে,
আমায় উত্তর না দিয়ে.
আমি মেঘকে জিজ্ঞেস করলাম

কোথায় আমার প্রিয়তমা
মেঘ গলে গেল
নীল আকাশে।
আমার একমাত্র বন্ধু তুমি
কোথায় আমার প্রিয়তমা

তুমি বল না, কোথায় লুকিয়েছে
তুমি কি জান, কোথায় সে।
উত্তর দিল ভক্ত বন্ধু

উত্তর দিল আন্তরিক বন্ধু
ছিল তোমার প্রিয়তমা
ছিল তোমার প্রিয়তমা
ছিল তোমার প্রিয়তমা
আর হয়ে গেল আমার বউ।

ক্রেমলিনের ঘন্টিগুলোতে রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসে জলদগম্ভীর স্বরে সোভিয়েত জনগণকে কমরেড লিওনিদ ব্রেঝনেভের নববর্ষের অভিনন্দন। এটি শুনতে শুনতে টেবিলে রাখা শ্যাম্পানস্কোয়ের বোতলগুলো একে একে কর্কমুক্ত হতে থাকে এবং তা থেকে গড়িয়ে পড়ে ফেনিল ধারা। আনন্দ-হুল্লোড়ের মাঝখানে হারিয়ে গেল আরো একটি বছর। নিচের ছবিতে আমি ও দীপঙ্কর দা, পেছনে নাসিম (মরিশাস) ও সমরজিৎ (ভারত)

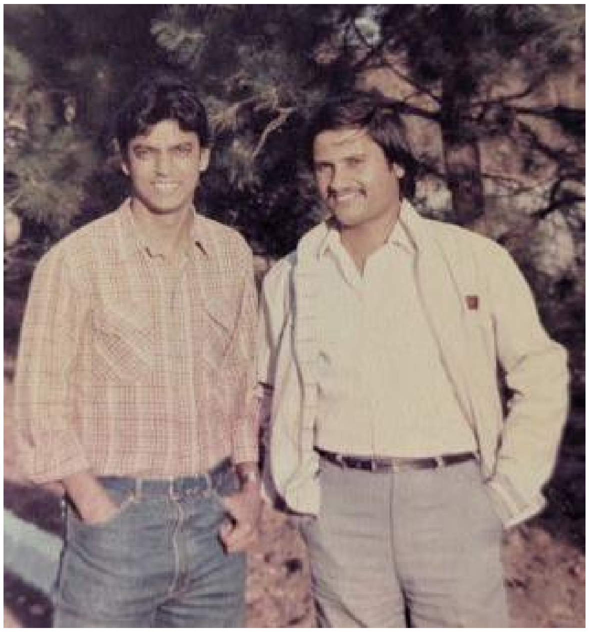

চতুর্থ বর্ষের শীতকালীন সেমিস্টার (১৯৮১) থেকে শুরু হয় যে বিষয়ের ওপর থিসিস লেখব, তার ওপর গবেষণা শুরুর প্রস্তুতি। আমি বেছে নেই উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগে অধ্যাপক ভালেনতিনা ভা. এফরেমভার তত্ত্বাবধানে গমের রাস্ট (পাতা ও কান্ডে মরিচা পড়া রোগ) রোগ প্রতিরোধ গুণের বংশানুক্রমিক ধারার অনুসন্ধান। গবেষণার ক্ষেত্র ছিল ক্রাসনাদার কৃষি গবেষণা ইনস্টিউটে, সেখানে কো-সুপারভাইজার ছিলেন গম প্রজনন বিভাগের সিনিয়র গবেষক এভদোকিয়া ভারানকোভা। শীতের শেষে মার্চ-এপ্রিলে শুরু হয় মাঠ গবেষণার প্রস্তুতি। জুলাইতে পরীক্ষাগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুরো সময় কাটতে থাকে গবেষণায়। আমরা আসার পর দীর্ঘদিন বাংলাদেশ থেকে কোন ছাত্র আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে নি। খুব সম্ভব ১৯৮১-র আগস্টে আসে মাসুদ (ডঃ মাসুদুর রহমান, মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিউট), তার পরের বছর জয়নাল (ড: গাজী জয়নাল আবেদীন,সিনিয়র গবেষক, বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিউট) এবং শ্যামল (শ্যামল কৃষ্ণ সাহা, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, জনতা ব্যাংক); ওপার বাংলা থেকে আসে চঞ্চল (ডঃ চঞ্চল ভট্টাচার্য্য, দিল্লী সরকারের অধীনস্থ এনিম্যাল হেলথ এক্সপার্ট)। ১৯৮২ সালে ক্রাসনাদার পলিটেকনিক ইনস্টিউটে (ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়) পড়তে আসে জহর (জহরলাল দেবনাথ, সিনিয়র নির্বাহী, ডেক্কো-ইশো গ্রুপ)। আমাদের ইনস্টিউটে মাস্টার্স প্রোগ্রামে পড়তে আসে ভারতীয় বংশদ্ভোভূত মরিশাসের নাগরিক নাসিম মুত্তুর। নাসিমের সঙ্গে খুব সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

১৯৮২-র পর থেকে ক্রাসনাদার মেডিকেল ইনস্টিটিউটে পিএইচডি প্রোগ্রামে পড়তে আসেন আমাদের সিনিয়র বেশ কয়েকজন ডাক্তার ভাই। নতুনদের আগমনে বাংলাদেশ ছাত্র সংগঠনের আকার বড় হয়ে ওঠে এবং আমাদের সামাজিক কর্মকান্ডে ফিরে আসে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য।

ফোর্থ ইয়ারে আমাদের সোশাল সায়েন্সের সাবজেক্ট ছিল সায়েন্টিফিক কমিউনিজম। আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, তাই এই বিষয়ের প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান তার প্রাসংগিকতা হারিয়েছে। বিপ্লব সম্পর্কে আমাদের ক্লাশরুমে যে ধারণা দেয়া হয়েছে, তা যদি আজ অন্যভাবে দেখি, তা হলে কেমন হয়? "বিপ্লব" শব্দটি মনে যে আনন্দ, ভয় ও বিস্ময়-মিশ্রিত আবেগের ঢেউ সৃষ্টি করে, তা ছেঁটে দিয়ে যদি আমরা নির্মোহ দৃষ্টিতে তাকাই, তা হলে বিপ্লব কি ? বিপ্লব আর কিছুই নয়, সমসাময়িক কালের সামাজিক শক্তিগুলোর ভারসাম্যকে উপেক্ষা করে অত্যন্ত দ্রুত গতির পরিবর্তন যেটি ইচ্ছে করেও ঠেকানো সম্ভব নয়। কিন্তু এটি আপনা আপনি ঘটে না, এর জন্য প্রয়োজন রূপকারের যিনি অনুধাবন করতে পারেন সঠিক মূহুর্তটি এসেছে, এটি হাতছাড়া করলে অপেক্ষা করতে হবে আরো বহুদিন। যেমন, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, মাও সে তুং, হো চি মিন, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, হুগো শাভেজ। বিপ্লব ধীর-গতির বিবর্তনকে বহু দ্রুত এগিয়ে দেয়, এখানে নায়ক তার রূপকার সময় নয়। যেমন রুশ বিপ্লবের নায়ক লেনিন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তার দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে মনে করতেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটার পূর্বশর্তগুলো পরিপক্ক হতে কমপক্ষে আরো একশ বছর লাগবে; কিন্তু ১৯১৭ সালে যখন মূহুর্তটি এসে যায়, তখন এর সুযোগ নিতে তিনি আর কোন দ্বিধা করেন নি। তাই বিপ্লব কাহিনীর বড় অংশ জুড়ে থাকেন তার নায়ক, তার মত করে কেউ উপলব্ধি করতে পারেন না বিপ্লবের ফলে উদ্ভুত পরিবর্তনগুলোর চ্যালেঞ্জ কত গভীর।

রূপকারের বিদায়ের পর উত্তরসূরীদের ঘাড়ে চাপে পরিবর্তিত যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন বিষয়বস্তু ধারণ করে বিপ্লবের অর্থবহতা বজায় রাখা। এটি কঠিন চ্যালেঞ্জ, সফলভাবে করতে পারলে এটিও বিপ্লবের মতই, কিন্তু মূল বিপ্লবের চলমান ধারায় ঘটে বলে তখন আর বিপ্লবের মত প্রতীয়মান হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় ও পরবর্তীতে সোভিয়েত আদলে সেখানে সমাজতন্ত্রের বিনির্মান ।মাও এর মৃত্যুর পর নতুন নেতা দেং শিয়াও পিং সরে আসেন সোভিয়েত মডেলের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে এবংশুরু করেন বাজারমুখী সংস্কার। দেং এর এই এক্সপেরিমেন্ট অভূতপূর্ব ছিল না। রুশ বিপ্লবের পর অস্বাভাবিক দ্রুততা ও অদক্ষতার সঙ্গে জাতীয়করণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ফলে শিল্প উৎপাদনে ধ্বস নামে এবং রাশিয়ার অর্থনীতি সংকুচিত হয়ে পড়ে। এটি প্রতিকারের জন্য লেনিনের নেতৃত্বে ১৯২১ সাল থেকে বাস্তবায়ন শুরু হয় নয়া অর্থনৈতিক নীতির (নোভায়া একোনমিচেস্কায়া পলিতিকা, সংক্ষেপে নেপ)। এই নীতির আওতায় অনেক শিল্পকারখানা আবার ব্যক্তি মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং বাজার অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করা হয়। প্রত্যাশা অনুযায়ী, "নেপের" আওতায় সাধিত সংস্কারগুলো দ্রুত কাঙ্খিত ফল দিতে শুরু করে।

কিন্তু চীনে যেমনটি ঘটেছে রাশিয়ায় আবার পূঁজিবাদ ফিরে আসার লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিপ্লবের শৈশাবস্থায় অত্যন্ত প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থতিতে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সম্ভব ছিল না উদীয়মান পূঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রণে রেখে ও কৌশলে ব্যবহার করে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করা, যেটি ছিল অগ্রাধিকার এবং করতে না পারলে পার্টির ক্ষমতায় থাকা দুরুহ হত। তাই লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিন নয়া অর্থনৈতিক নীতি অবলুপ্ত করে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার আওতায় সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে অবতীর্ণ হন। পক্ষান্তরে মাও-এর মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরী দেং যখন "নেপ"-এর আদলে বাজারমুখী সংস্কার শুরু করেন, তখন চীনে সমাজতন্ত্রের ভিত মজবুত, চীনা কমুনিস্ট পার্টির ক্ষমতার ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য, সোভিয়েত বিরোধিতাকে পূঁজি করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত মিত্রতা; সব মিলিয়ে অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনার জন্য পরিস্থিতি ছিল অনুকূলে। সর্বোপরি দেং-এর ফোকাস ছিল শুধুমাত্র অর্থনীতির ওপর, পূঁজিবাদকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও চীনকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। দেং মাও সে তুং এর চিন্তাধারা থেকে সরে আসলেও তার রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেন নি। চীনা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল রাজনৈতিক আদর্শের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে জনগণের কাছে পার্টির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছেন এবং পার্টির নৈতিক ভিতকে দৃঢ় করেছেন। দেং চলে যাওয়ার পর তার উত্তরসূরীরা - জিয়াং জে মিন, হু জিনতাও ও শি জিনপিং তার শুরু করা সংস্কার কর্মসূচি বিভিন্ন মাত্রায় চালিয়ে গেছেন।

এর সুফল চীন এবং চীনা জনগণ ভোগ করেছে পূর্ণমাত্রায়। সত্তুর দশকের শেষদিকের চীন, দারিদ্র্যে নিমজ্জিত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ, চার দশকের ব্যবধানে রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে এবং অঘোষিত দ্বিতীয় পরাশক্তিতে, যার উত্থান ঠেকাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুরু করেছেন বানিজ্য যুদ্ধ এবং নানাবিধ অবরোধ। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই চীনের রূপান্তর কতটা আকাশচুম্বী তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । ১৯৮০ সালে দেশটির মোট জিডিপি ছিল ১৯১.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৮ সালে তা দাড়িঁয়েছে ১৩.৬১ ট্রিলিয়ন ডলারে, অর্থাৎ অর্থনীতি স্ফীত হয়েছে ৭১ গুণ। মাথাপিছু আয় এই কালপর্বে ১৯৫ মার্কিন ডলার থেকে ৫০ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯,৭৭১ ডলারে। কিন্তু যে সাফল্য চোখ ধাঁধানো, যার ধারে কাছেও কোন দেশ যেতে পারবে না এবং যেটি সম্ভব হয়েছে চীনের স্বকীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কারণে, তা হল দারিদ্র্য সীমার নিচ থেকে মানুষকে ওপরে টেনে তোলা। এ সময় দারিদ্র্য সীমা অতিক্রম করেছে ৮০০ মিলিয়ন চীনা নাগরিক। ১৯৮১ তে দেশের জনসংখ্যার ৮৮ শতাংশ বসবাস করত চরম দারিদ্রে, বর্তমানে তা ১ শতাংশের নিচে নেমে গেছে। চীনের এই রূপান্তর কোন বিবর্তন নয়, যে কোন মাপকাঠিতেই এটি বিপ্লব, কিন্তু এই বিপ্লবটি ঘটত না যদি প্রথম বিপ্লবটি না ঘটত।

সোভিয়েত ইউনিয়নেরও প্রথম দিকের সাফল্য কম চমকপ্রদ ছিল না। ১৯১৭ সালের বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ছিল অনুন্নত, জনসংখ্যার বিশাল অংশ দারিদ্র্যে নিমজ্জিত, কৃষি-ভিত্তিক দেশ। তিন দশকের ব্যবধানে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিণত হয় আধুনিক, শিল্পোন্নত দেশে ও বিশ্বের দ্বিতীয় পরাশক্তিতে। কিন্তু এই রূপান্তরের পেছনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যতটা না নিয়ামক ছিল, তার চেয়ে বেশি নিয়ামক ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশাল বিজয়ের সূত্র ধরে পরাক্রম সামরিক শক্তি অর্জন,ও বিজয়ী পশ্চিমা মিত্রদের সঙ্গে গোটা বিশ্বকে ভাগ করে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসা ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণা ও মারনাস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই অভূতপূর্ব রূপান্তরের ভিত মজবুত ও টেকসই করার জন্য প্রয়োজন ছিল চীনের মতই অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করা এবং এর জন্য নতুন পথের সন্ধান করা। চীনে যেমন প্রথম বিপ্লবের আবেগ ও তাৎপর্য্য তিন দশক পর এর স্থপতি মাও সে তুং-এর মৃত্যুর পর নতুন আলোকে মূল্যায়নের মুখে পড়ে, সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্যও সেই মূহুর্তটি হাজির হয়, ঐতিহাসিকভাবে তুলনামূলক ১৯৫০-র মাঝামাঝি, রাষ্ট্রের স্থপতি লেনিন ও সমাজতন্ত্রের নির্মাতা স্তালিনের প্রস্থানের পর। দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রথম নেতা নিকিতা সের্গেয়িয়েভচ ক্রুশ্চেভও স্তালিনের শাসনামলের নিচে লাইন টেনে নতুন যুগের সূচনা করেন, কিন্তু বেছে নেয়া পথটি ছিল ভুল। চীনের সাফল্য হল প্রথম বিপ্লবের স্বপ্নকে বিকল্প পথে দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া, যাকে বর্তমান নেতা "চাইনিজ ড্রিম" নামে অভিহিত করেছেন।
পক্ষান্তরে স্তালিন-পরবর্তী যুগে অক্টোবর বিপ্লবের প্রেরণাদায়ী আদর্শিক শক্তি মার্কসবাদ সোভিয়েত ইউনিয়নে ধর্মীয় মতবাদের মত একটি অচলায়তনে পরিণত হয়। সৃষ্টিশীল চর্চার মাধ্যমে মার্কসবাদকে বিকাশ করার পরিবর্তে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি প্রচারণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। মার্কস ও তার সহযোদ্ধা এঙ্গেলস শতাব্দী পূর্বে যা লিখে গেছেন এবং এরপর রাশিয়ার প্রেক্ষাপটে লেনিন মার্কসবাদ প্রয়োগের ওপর তার যে সব ধ্যান ধারণা ব্যক্ত করেছেন শুধু সেগুলিরই প্রকাশনা ও বিস্তার চলতে

থাকে। অথচ সর্বহারা বিপ্লবের পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ওপর দায়িত্ব ছিল মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটানো। আমাদের কোর্স শেষ হয়ে যাবার আর খুব বেশি বাকী ছিল না। ফোর্থ ইয়ারের গ্রীষ্মের পুরো সময় কাটে মাঠ গবেষণায় ও লাইব্রেরীতে বসে লিটারেচার সার্ভে করে। তখন ইন্টারনেট, ল্যাপটপ কমপিউটার এ সব কিছু ছিল না। তথ্য আহরণের একমাত্র মাধ্যম ছিল প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়াল, তাই লাইব্রেরীতে বসে বইপত্র এবং বৈজ্ঞানিক জার্নাল পড়ার বিকল্প ছিল না।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়: পঞ্চম ও শেষ বর্ষে পদার্পণ

১৯৮১ সালের শরতকালীন সেমিস্টারের শুরুতে (সেপ্টেম্বর থেকে) আমরা উঠে যাই ফাইনাল ইয়ারে পঞ্চম বর্ষে। নতুন যে বিষয়গুলো যোগ হয় তার মাঝে ছিল: অর্থকরী ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল, কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কমপিউটিং মেশিনস, ইকোনমিক-ম্যাথমেটিক্যাল মেথডস ইন এগ্রিকালচার। সেপ্টেম্বরের শেষে ফসল কর্তনের পর হাতে আসে গবেষণালব্ধ তথ্য ও উপাত্ত, ও শুরু হয় এ সব তথ্য গবেষণার ডিজাইন অনুসারে পরিসংখ্যানের সূত্রে প্রক্রিয়াজাত করা ও থিসিস লেখার প্রক্রিয়া। তখনকার দিনে ওয়ার্ডপ্রসেসিং না থাকার কারণে হাতে লিখে থিসিসের পাণ্ডুলিপি টাইপ করিয়ে আনতে হত। তারপর দেখতেন সুপারভাইজার এবং অপোনেন্ট (রিভিউয়ার)।এ জন্য সকল ভুলভ্রান্তি শোধরিয়ে থিসিস চূড়ান্ত করতে অনেক সময় লাগত। শূন্য থেকে শিখা বিদেশী ভাষায় মাস্টার্সের থিসিস লেখা ছিল একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। স্বভাবতই পড়াশোনার চাপ ছিল খুব বেশি । তারপরও নতুনদের - মাসুদ, জহর, জয়নাল, শ্যামল, চঞ্চল, বিনোদ (নেপাল), নাসিম (মরিশাস) - সঙ্গে আড্ডা দিতে ভাল লাগতো; সঙ্গে থাকতেন দীপঙ্করদা এবং আমিনভাই।
নিচের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে: বাঁ থেকে বসা সুবাসদা, জহর, ময়নাভাই, ইকবাল শহীদ ভাই, স্বপনদা, গোলাম কবীর ভাই ও রেজাউল করিম ভাই। দাঁড়ানো বাঁ থেকে জয়নাল, শ্যামল, খলিল, ইন্দ্রজিৎ, মাসুদ, শামসু ভাই ও মঞ্জু ভাই।

এরপর পর্যায়ক্রমে আসে দেবাশীষ (দেবাশীষ চন্দ), অনুপমা (অনুপমা দত্ত, পঃ বঙ্গ) এবং সবার শেষে (আমি থাকাকালীন) আসে রিবেলচিক (মাহফুজুল হক) ও ফিরোজ (ফিরোজ আলম)। আমাদের ছোটদের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাচে ভারত থেকে আসে রাজেন্দ্র, অজয়,দয়ামনি, সমরজিৎ; নেপাল থেকে বিনোদ, বাবুরাম এবং আরো কয়েকজন; শ্রীলঙ্কা থেকে কয়েকজন মেয়ে (কারোর নাম

মনে নেই) ও পাকিস্তান থেকে জাফর, আসলাম ও হারুন (এরা এসেছিল পাকিস্তানের মজদুর কিষাণ পার্টির মাধ্যমে)। এরা সবাই আমাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতো। হঠাৎ করে চারপাশ থেকে দাদা ডাক শুনতে শুনতে মনে হল আমরাও সিনিয়র হয়ে গেছি।

জহর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিউটে পড়লেও ক্লাশের পর ওর অধিকাংশ সময় কাটতো আমাদের হোস্টেলে, খাবার প্রতি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী আকর্ষণ। তিন-চারটি ডিম দিয়ে ওমলেট খাওয়া, কেটলিতে সুতোয় বাঁধা সসিস্কি (সশেজ) জল ফুটিয়ে তাতে সিদ্ধ করে একের পর এক খেয়ে যাওয়া। রুশ ছাত্রদের প্রিয় একটি খাবার আমাদের মত ওরও খুব প্রিয় ছিল। তা হল আলু গোল করে চাক চাক করে কেটে কড়াইতে ঢেলে তার ওপর রিং সাইজের কাটা পেয়াঁজ বিছিয়ে ওপরে চর্বি (এনিমেল ফ্যাট) টুকরো করে কেটে রেখে দিয়ে ঢাকনি দিয়ে বন্ধ করে মৃদু আঁচের চুলার ওপর আধঘন্টা রেখে দেয়া। এরপর ঢাকনি খুললে যে গন্ধ বের হত, তা ভুলার মত নয়। তারপর রান্নাঘর থেকে রুমে এনে আলুভাজা বুলচকা (ব্রেড) কেটে তা দিয়ে সবাই মিলে খাওয়া। ছোটদের মাঝে মাসুদ ছিল ধীর, স্থির, নম্র প্রকৃতির। জহর, জয়নাল, শ্যামল, চঞ্চল - ওরাও ও রকমই ছিল, কিন্তু আইডিয়োলজিক্যালি সাংঘাতিক কমিটেড, পার্টির আদর্শের প্রতি ছিল অবিচল আস্থা। আমাদের মেডিক্যালের বড় ভাইদের সবাই ছিলেন ম্যাচিউর; জীবনে ইতিমধ্যে অনেক কিছু দেখে এসেছেন; তাই সমাজতন্ত্র নিয়ে তাদের মাঝে আবেগ-অনুভূতির লেশমাত্র ছিল না। এভাবেই বড় পরিসরে ছোটরা আসার পর আমাদের সামাজিক জীবন ভীষণ গতিশীল হয়ে ওঠে।

সাতই নভেম্বর অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপন নতুনদের জন্য ছিল অনন্য অভিজ্ঞতা। আমরা আসার পর প্রথম দিনগুলোতে যে সব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গিয়েছি, নতুনদেরও ছিল একই অভিজ্ঞতা। বিপ্লব দিবসের মিছিল শেষ হয়ে যাবার পর জহর সহ আমরা কজন আমাদের ইনস্টিউটের সঙ্গে লাগোয়া সেভেরনায়া স্ট্রিটের কোণায় পিভার স্টলটিতে যাই। সেখানে অনেকক্ষণ বসে শুকনো মাছ সহকারে পিভা ড্রিংক করতে করতে নতুনদের সঙ্গে নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করি। রুশ ভাষা শেখা ছিল সবার জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ জন্য প্রায়দিনের সন্ধ্যাবেলায় চার নম্বর হোস্টেলে আসতাম ছোটদের রুশ ভাষা রপ্ত করতে সাহায্য করায়। এ ভাবেই ডিসেম্বর মাস এসে যায়; আমাদের শিক্ষাজীবনে ছুটির ঘন্টা বেজে ওঠে। ছোটরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে তাদের প্রস্তুতিপর্বের পরীক্ষা নিয়ে, আমাদের ব্যস্ত সময় কাটতে থাকে থিসিস চূড়ান্ত করতে। ডিসেম্বরের শেষ দিকে ক্লাশগুলো শেষ হয়ে যায়। শুরু হয় পরীক্ষার প্রস্তুতি। ১৯৮২-র জানুয়ারীতে শুরু হওয়া পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারটি ছিল সংক্ষিপ্ত। জানুয়ারীর শেষে পঞ্চম বর্ষের পরীক্ষাগুলো হয়ে যায়। সামনে থাকে দর্শনের ওপর স্টেট একজাম, একটি বোর্ড এ পরীক্ষাটি নেবে। পাঠ্যক্রমের আওতায় ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত আমরা মোট ৪৯ টি বিষয়ের ওপর ক্লাসরুম লেকচার শুনেছি, সাতটি বিষয়ের ওপর কোর্স ওয়ার্ক (মিনি থিসিস) লিখেছি, আটটি বিষয়ের ওপর মোট ৫৪ সপ্তাহের ফিল্ড প্রাকটিকাল ওয়ার্ক করেছি। মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনের শর্ত হিসেবে উদ্ভিদ প্রজনন ও বীজ উৎপাদন বিভাগে অধ্যাপক ভালেনতিনা ভা. এফরেমোভার তত্বাবধানে এক বছরের গবেষণার ভিত্তিতে “A Study on inheritance of rust resistance in common wheat” শীর্ষক একটি থিসিস লিখেছি।

পঠিত বিষয়গুলোর মাঝে ৩৭ টি বিষয় ছিল কৃষি ও কৃষি-সম্পর্কিত বিজ্ঞান, ছয়টি বিষয় ছিল মৌলিক বিজ্ঞান,ও ছয়টি ছিল মানবিক। অধ্যয়নের পুরো সময় আমাদের মোট ৫০০২ ঘন্টার ক্লাসরুম লেকচার শুনতে হয়েছে। এর ৬২.৭৩ শতাংশ ছিল কৃষি ও কৃষি-সম্পর্কিত বিজ্ঞানের ওপর; ১১.৬৮ শতাংশ ছিল মৌলিক বিজ্ঞানের ওপর অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষের মোট ৭৪.৪১ শতাংশ ঘন্টা ব্যয় হয়েছে কৃষি ও মৌলিক বিজ্ঞানের ওপর। বাকী ২৫.৫৯ শতাংশ ব্যয় হয়েছে মানবিক বিষয়গুলোর ওপর - ভাষা (রুশ), দর্শন, ইতিহাস, রাজনৈতিক অর্থনীতি, ও বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ। বলার অপেক্ষা রাখে না মানবিক বিষয়গুলোর অধ্যয়ন সোভিয়েত গ্রাজুয়েটদের দৃষ্টিভঙ্গিকে রেখেছে প্রসারিত। সোভিয়েত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে শিক্ষিত রোবট বের হত না, বের হত স্ব স্ব পেশায় সুশিক্ষিত ও সমাজ-সচেতন গ্র্যাজুয়েট যারা জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারে।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পঠিত প্রতিটি সাবজেক্টে আমার প্রাপ্ত নম্বর ছিল "এক্সেলেন্ট (পাঁচের মাঝে পাঁচ)"। পুরো জানুয়ারী মাস কেটে যায় থিসিসটি চূড়ান্ত করে ডিফেন্সের জন্য ট্রপিকাল ও সাবট্রপিকাল এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টির ডিন অফিসে জমা দিতে। ফেব্রুয়ারীর শুরুতে দর্শনের ওপর স্টেট একজাম অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণ অধ্যাপকদের নিয়ে গঠিত একটি প্যানেল এই পরীক্ষাটি নেয়। এই পরীক্ষাটি ছিল মূলতঃ আমাদের এ পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়গুলোতে (মার্কসীয় দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি, সাম্যবাদ) যা পড়ানো হয়েছে তারই সারসংক্ষেপ। সব পরীক্ষকের সন্তুষ্টি বিধান করে এই পরীক্ষাটিও "এক্সেলেন্ট" নম্বর নিয়ে পাশ করি। চূড়ান্ত পরীক্ষাটি ছিল বোর্ডের সামনে থিসিস ডিফেন্ড করা, এতে সভাপতিত্ব করতেন ইনস্টিউটের রেক্টর (উপাচার্য), সদস্য হিসেবে থাকতেন উপ-রেক্টর, ফ্যাকল্টির ডিন, এবং সিনিয়র অধ্যাপকরা। আমরা (হারুন, আমি, খলিল, আবুল, মানসদা, তাহের) কে কখন আমাদের থিসিস ডিফেন্ড করব, তার শিডিউল ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে এসে যায়। বড় মিয়ার

নেতৃত্বে আমরা কি ভাবে থিসিস ডিফেন্ড করব তার মহড়া চলতে থাকে। আমার নির্ধারিত দিনটি এসে যায়। দুরু দুরু চিত্তে হাজির হই ফ্যাকাল্টির কনফারেন্স রুমে; আমার ডাক পড়লে ভিতরে প্রবেশ করি।

শুরু হয় থিসিসের সারসংক্ষেপ উত্থাপন করে, তারপর প্রশ্নোত্তর পর্বের পালা; বিষয়বস্তুর ওপর পরীক্ষকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেই। শেষ হয়ে যায় নির্ধারিত সময়সীমা এবং আমি বেরিয়ে আসি। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে বেদনায় বুকটি মোচড় দিয়ে ওঠে। শেষ হয়ে গেল আমাদের শিক্ষাজীবন। যখন ডিফেন্সের ফল ঘোষণা করা হল, দেখা যায় এটিও আমি "এক্সেলেন্ট" নম্বর নিয়ে পাশ করেছি।

১৯৮২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইনস্টিউটের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় সমাবর্তন উৎসব। শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র, পাশ্চাত্যের মত গাউন পড়ে আভিজাত্য দেখাবার রীতি চালু ছিল না। কিন্তু নিজস্ব ধারার ঐতিহ্যও কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। নাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাগত পরিপূর্ণ হলে ধীরপদে এগিয়ে যাই মঞ্চের দিকে। উষ্ণ করমর্দন শেষে সনদ ও পুরষ্কার গ্রহণ করি শ্রদ্ধাভাজন উপাচার্য ড: ইভান তিমাফেইয়েভিচ ক্রবিলিনের হাত থেকে। এ সময় নিঃশব্দতা ভেদ করে সুরের মুর্ছনায় বেজে ওঠে বিজয়ের ঝংকার ধ্বনি ও অভ্যাগতদের করতালি। এ ভাবেই মানসদা, হারুন, খলিল, আবুল ও তাহের পালাক্রমে উপাচার্যের হাত থেকে সনদ ও পুরষ্কার গ্রহণ করে। নিজের সিটে বসে বাইন্ডার
খুলে দেখি আমাকে দেয়া হয়েছে কৃষি বিজ্ঞানে অনার্স সহ মাস্টার্স ডিগ্রি (Masters in Agricultural Sciences with specialization in Agronomy), সঙ্গে রুশ ও ইংরেজি ভার্সানে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপট। নিচের ছবিগুলোতে দেখানো
হল। বারবার উল্টেপাল্টে দেখতে থাকি । আনন্দের আতিশয্যে চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে; জীবন চলার পথে প্রথম মূল্যবান পাথেয়।

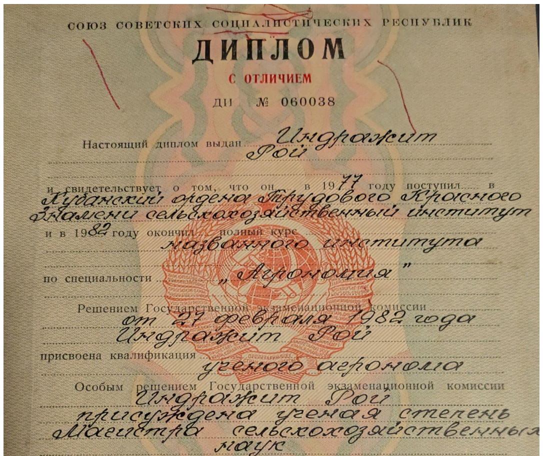

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ДИ № 060038

Настоящий диплом выдан Индражит Рой

и свидетельствует о том, что он в 1977 году поступил в Кубанский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт

и в 1982 году окончил полный курс названного института

по специальности „Агрономия"

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 27 февраля 1982 года Индражит Рой

присвоена квалификация ученого агронома

Особым решением Государственной экзаменационной комиссии Индражит Рой присуждена ученая степень Магистра сельскохозяйственных наук

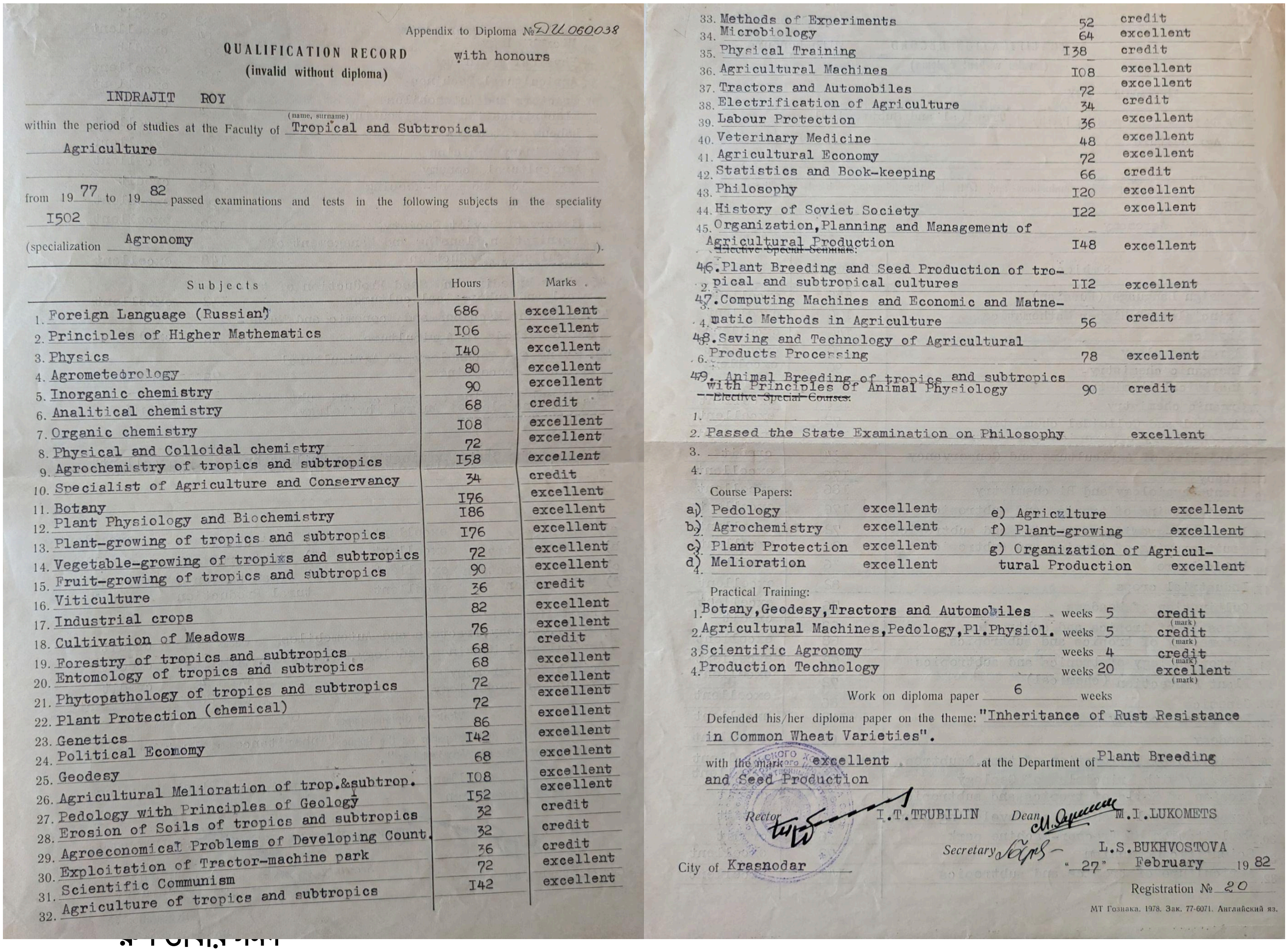

Appendix to Diploma № ДИ 060038

QUALIFICATION RECORD with honours

(invalid without diploma)

INDRAJIT ROY

(name, surname)

within the period of studies at the Faculty of Tropical and Subtropical Agriculture

from 1977 to 1982 passed examinations and tests in the following subjects in the speciality I502

(specialization Agronomy).

Subjects	Hours	Marks
1. Foreign Language (Russian)	686	excellent
2. Principles of Higher Mathematics	I06	excellent
3. Physics	I40	excellent
4. Agrometeorology	80	excellent
5. Inorganic chemistry	90	excellent
6. Analitical chemistry	68	credit
7. Organic chemistry	I08	excellent
8. Physical and Colloidal chemistry	72	excellent
9. Agrochemistry of tropics and subtropics	I58	excellent
10. Specialist of Agriculture and Conservancy	34	credit
11. Botany	I76	excellent
12. Plant Physiology and Biochemistry	I86	excellent
13. Plant-growing of tropics and subtropics	I76	excellent
14. Vegetable-growing of tropics and subtropics	72	excellent
15. Fruit-growing of tropics and subtropics	90	excellent
16. Viticulture	36	credit
17. Industrial crops	82	excellent
18. Cultivation of Meadows	76	excellent
19. Forestry of tropics and subtropics	68	credit
20. Entomology of tropics and subtropics	68	excellent
21. Phytopathology of tropics and subtropics	72	excellent
22. Plant Protection (chemical)	72	excellent
23. Genetics	86	excellent
24. Political Ecomomy	I42	excellent
25. Geodesy	68	excellent
26. Agricultural Melioration of trop.&subtrop.	I08	excellent
27. Pedology with Principles of Geology	I52	excellent
28. Erosion of Soils of tropics and subtropics	32	credit
29. Agroeconomical Problems of Developing Count.	32	credit
30. Exploitation of Tractor-machine park	36	credit
31. Scientific Communism	72	excellent
32. Agriculture of tropics and subtropics	I42	excellent
33. Methods of Experiments	52	credit
34. Microbiology	64	excellent
35. Physical Training	I38	credit
36. Agricultural Machines	I08	excellent
37. Tractors and Automobiles	72	excellent
38. Electrification of Agriculture	34	credit
39. Labour Protection	36	excellent
40. Veterinary Medicine	48	excellent
41. Agricultural Economy	72	excellent
42. Statistics and Book-keeping	66	credit
43. Philosophy	I20	excellent
44. History of Soviet Society	I22	excellent
45. Organization, Planning and Management of Agricultural Production	I48	excellent
~~Elective Special Seminars:~~		
46. Plant Breeding and Seed Production of tropical and subtropical cultures	II2	excellent
47. Computing Machines and Economic and Matnematic Methods in Agriculture	56	credit
48. Saving and Technology of Agricultural Products Processing	78	excellent
49. Animal Breeding of tropics and subtropics with Principles of Animal Physiology	90	credit

~~Elective Special Courses:~~

1.
2. Passed the State Examination on Philosophy — excellent
3.
4.

Course Papers:

a) Pedology	excellent	e) Agriculture	excellent
b) Agrochemistry	excellent	f) Plant-growing	excellent
c) Plant Protection	excellent	g) Organization of Agricultural Production	excellent
d) Melioration	excellent		

Practical Training:

1. Botany, Geodesy, Tractors and Automobiles — weeks 5 — credit (mark)
2. Agricultural Machines, Pedology, Pl. Physiol. — weeks 5 — credit (mark)
3. Scientific Agronomy — weeks 4 — credit (mark)
4. Production Technology — weeks 20 — excellent (mark)

Work on diploma paper 6 weeks

Defended his/her diploma paper on the theme: "Inheritance of Rust Resistance in Common Wheat Varieties".

with the mark excellent at the Department of Plant Breeding and Seed Production

Rector I.T.TRUBILIN Dean M.I.LUKOMETS

Secretary L.S.BUKHVOSTOVA

City of Krasnodar "27" February 1982

Registration № 20

МТ Гознака. 1978. Зак. 77-6071. Английский яз.

কৃষি বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর পাশাপাশি আমাদেরকে আরো একটি সনদ দেয়া হয় - রুশ ভাষার (যে কোর্সগুলোতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়) শিক্ষক। যে সব শর্ত পূরণ করে এই সনদ দেয়া হয় তা হলো: ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮২ সাল মেয়াদে

৫৯২ ঘন্টা রুশ ভাষার শিক্ষা গ্রহণ, "বিদেশী ভাষা হিসেবে রুশ ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি" শীর্ষক ৭২ ঘন্টা মেয়াদী কোর্সে অংশগ্রহণ, এবং রুশ ভাষার ওপর কেন্দ্র-পরিচালিত পরীক্ষায় (State Examination) উত্তীর্ণ হওয়া। নিচের ছবিগুলোতে দেখানো হল। । ক্লাসরুমে রুশ ভাষা পড়ানোর সুযোগ আসে নি কখনো। কিন্তু এই ভাষা জীবনকে করেছে সমৃদ্ধ। রুশ ভাষায় লেখা অনেক কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ বাংলায় ও বাংলা ভাষায় লেখা অনেক কবিতা প্রবন্ধ রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছি। কর্ম জীবনের এক পর্যায়ে রুশ ভাষা জ্ঞান ইংরেজির পাশাপাশি আরো একটি বিদেশী ভাষা জানার শর্ত পূরণ করেছে।

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

СВИДЕТЕЛЬСТВО

СВ № 010366

Настоящим удостоверяется, что гражданин (~~гражданка~~) Индражит Рой (фамилия, имя)

страна Бангладеш

за время обучения в Кубанском ордена Трудового Красного Знамени сельхозинституте (название высшего учебного заведения)

с 1977 по 1982 г. изучал(а) русский язык в объеме 592 часов, прослушал(а) курс „Методика преподавания русского языка как иностранного" в объеме 72 часов и сдал(а) государственный экзамен по русскому языку.

Гражданин (~~гражданка~~) Индражит Рой (фамилия, имя)

имеет право преподавать русский язык на факультативных курсах.

Ректор

Секретарь

Город Краснодар „28" февраля 1986 г.

Регистрационный № 57

Гознак. 1981.

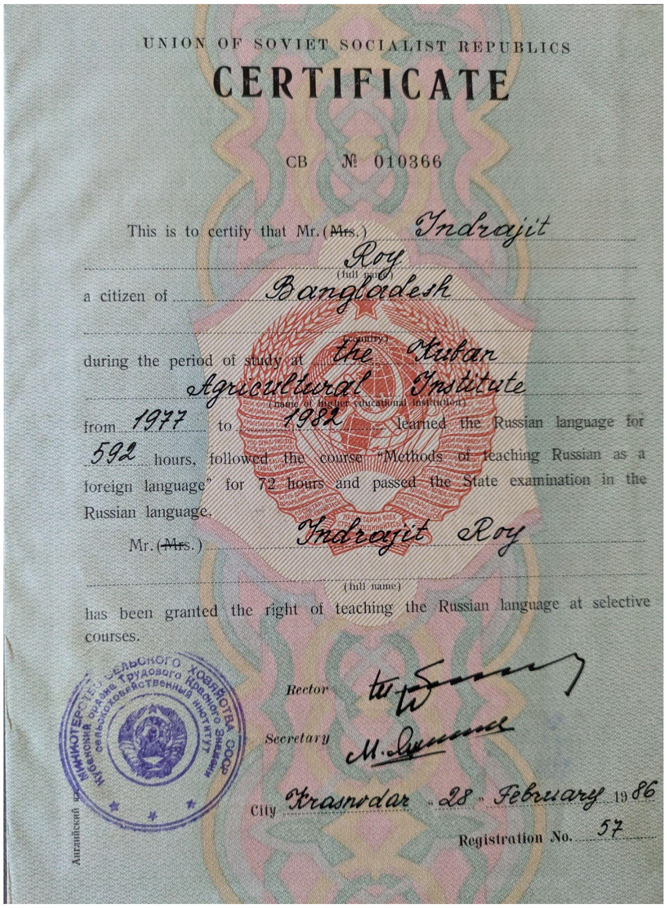
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS

CERTIFICATE

СВ № 010366

This is to certify that Mr. (~~Mrs.~~) Indrajit Roy (full name)

a citizen of Bangladesh (country)

during the period of study at the Kuban Agricultural Institute (name of higher educational institution)

from 1977 to 1982 learned the Russian language for 592 hours, followed the course "Methods of teaching Russian as a foreign language" for 72 hours and passed the State examination in the Russian language.

Mr. (~~Mrs.~~) Indrajit Roy (full name)

has been granted the right of teaching the Russian language at selective courses.

Rector

Secretary

City Krasnodar „28" February 1986

Registration No. 57

এরপর প্রথা অনুযায়ী তোলা হয় আমাদের গ্রুপ ছবি; নিচে দেখানো হলো (আমার গ্রুপ ছিল ৫৩) I সবার উপরে ডান দিক থেকে মানস কুমার সাহা (বাংলাদেশ); তারপর বাম দিক থেকে: গেন্নাদি কোভালেনকো (সোভিয়েত ইউনিয়ন), ফোফানা সানুসি (বুরকিনা ফাসো), আমাদের অনুষদের ডিন নিকোলাই সিমিয়োনোভিচ কতলেয়ারভ, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ইভান তিমাফেইয়েভিচ ক্রবিলিন, সহকারী ডিন মিখাইল লুকামেৎস, অর্থনীতির অধ্যাপক মার্গারিতা দেমিরচান,আবদেল তাকেদিন (প্যালেস্টাইন),ঝিঝো আবাতে (ইথিওপিয়া) মভুনগি এলিউথের (তানজানিয়া), জাইয়েদ মুবারক (জর্ডান); ইন্দ্রজিৎ রায় (বাংলাদেশ), আনাতোলি ববরুস (সোভিয়েত ইউনিয়ন), সাকাফ সাকাফ আব্দুর রহমান (ইয়েমেন),গ্লোরিয়া কিনতানো (পেরু), অনকে আইয়েলে (ইথিওপিয়া), গিজাচেউ বেলাইনে (ইথিওপিয়া), খলিলুর রহমান (বাংলাদেশ), অসকার রদরিগেজ (ইকুয়েডের), বেলাইনে গিতাচেউ (ইথিওপিয়া), ইসসাম মাহমুদ (প্যালেসটাইন), সের্গেই মাজনিচেনকো (সোভিয়েত ইউনিয়ন), ম্যারিয়াম মার্তিনেজ (চিলি), আলেকসান্দর আদিনৎসোভ (সোভিয়েত ইউনিয়ন), বানুসি বাংবা (বুরকিনা ফাসো), চার্লি সিভিরিন (তানজানিয়া), মালা বেনজামিন (কেনিয়া)।

তারপর মূল ভবনের সামনে তোলা হয় পুরো ক্লাসের ছবি (উপরে দেখানো হল)।

এ সময়ে তোলা আরেকটি গ্রুপ ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রথম সারিতে বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে তাহের,সুবাসদা, খলিল, আমাদের শিক্ষক, মাসুদ, মানসদা, আমি, শিক্ষক নিকোলাই, নিকোলায়েভিচ নেশ্যাদিম, পরমেশ নন্দীদা ও মোস্তফা জামান আবুল।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানের এটি ছিল প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বটি কয়েকদিন পর সন্ধ্যাবেলায় অনুষ্ঠিত হয় স্তালোভায়াতে (ক্যাফেটেরিয়াতে)। এই দিন ইনস্টিটউট কর্তৃপক্ষ সদ্য বের হওয়া গ্রাজুয়েটদের জন্য আয়োজন করেন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের।

উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য, ডিন, শিক্ষকবৃন্দ ও নগর প্রশাসনের কর্মকর্তারা। নতুন গ্রাজুয়েটদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ও সাফল্য কামনা করে তারা বক্তব্য রাখেন। খাবার টেবিলে ছিল বিশাল আয়োজন, সে দিন বিয়ার আর ওয়াইনের স্বাদ নিতে কোন বাধা ছিল না।, এরপর শুরু হয় নৃত্যানুষ্ঠান, চলে গভীর রাত পর্যন্ত। এ দিনটির স্মৃতি আমাদের কারো পক্ষে ভুলা সম্ভব নয়।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়: ছাত্র থেকে আসপিরান্ত (পিএইচডি গবেষক)

রুশ ভাষায় পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের লক্ষ্যে নিয়োজিতদের বলা হয় আসপিরান্ত। সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর শুরু হয় বিদেশী গ্রাজুয়েটদের বাড়ী ফেরার প্রস্তুতি। কিন্তু আমাদের মাঝে আমি, খলিল ও মোস্তফা জামান পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য সোভিয়েত শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে বৃত্তির আবেদন করি। আমাদের সিনিয়ার - অসীমদা, হাবিবভাই, নন্দীদা,ও সুবাসদা পিএইচডিতে ছিলেন, যা দেখে আমরাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। ভাগ্যক্রমে আমাদের আবেদন অনুমোদিত হয় এবং আমরা পিএইচডিতে ভর্তি হয়ে যাই। আমাদের দশ নম্বর ছাত্রাবাস ছেড়ে দিতে হলো; আমরা উঠলাম পাশের এগার নম্বর হোস্টেলে। এবার প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ হলো আলাদা রুম। আমি পেলাম তিন তলায় ৩২৭ নম্বর কক্ষ। আমার কক্ষটির জানালা ঘেষে ছিল একটি বার্চ গাছ, শীতকালে পাতাবিহীন ডালপালাগুলো তুষারে আবৃত হয়ে থাকত (নিচের ছবি)। প্রকৃতিপ্রেমী রুশ কবি সের্গেই ইয়েসেনিন তার একটি কবিতায় এর একটি চিত্র এইভাবে এঁকেছেন (কবিতাটির বাংলা অনুবাদ আমি করেছি)।

আমার জানালার ধারে শ্বেতশুভ্র বার্চ

সের্গেই ইয়েসেনিন
Белая берёза под моим окном
Сергей Есенин

শ্বেতশুভ্র বার্চ গাছ
আমার জানালার ধারে
ঢেকে আছে তুষারে,
অবিকল রূপোর মতন।
তুষারের আবরণে
তুলতুলে ডালগুলোতে
ঝুলছে সাদা পাড়ের,
থোকা থোকা সুতোর মালা।

তন্দ্রাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতায়
দাড়িয়ে বার্চ গাছ
তুষারের কণাগুলো জ্বলছে,
সোনালী আগুনে।
আর ভোর অলসভাবে
চারপাশ ঘুরে
ডালগুলোতে ছিটিয়ে দিচ্ছে
নতুন রূপো।

Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
обсыпает ветки
Новым серебром.

পিএইচডি গবেষণার সুপারভাইজার হিসেবে পেলাম ট্রপিক্যাল ক্রপ প্রোডাকশন বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক আলেকসান্দর পাভলোভিচ স্মিতানিনকে। তিনি ইতিপূর্বে ক্রাসনাদার কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা ইনস্টিউটের প্রজনন বিভাগের প্রধান ছিলেন।

গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারিত হয় হাইব্রিড রাইস ব্রিডিং। ১৯৮২ সালের মে-জুন মাস থেকে গ্রিনহাউজ এবং মাঠে গবেষনা স্থাপন করার কাজ শুরু হয়ে যায়। নিচের ছবিতে আমার সংগে আমার গাইড প্রফেসর স্মিতানিনকে দেখা যাচ্ছে।

১৯৮২ সাল ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য ক্রান্তিকাল। ৭ই নভেম্বর উদযাপিত হয় মহান অক্টোবর বিপ্লবের ৬৫-তম বার্ষিকী। রাষ্ট্রাচারের নিয়ম মেনে ৭৫ বছর বয়স্ক ও নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেঝনেভ রেড স্কোয়ারে লেনিনের ম্যুসোলিয়ামের ওপর দাঁড়িয়ে সামরিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও জনতার অভিবাদন গ্রহণ করেন। অসুস্থতার কারণে দেশের সর্বময় নেতা অনেকদিন জনসমক্ষে আসেন নি। ১০ই নভেম্বর ১৯৮২ সালে লিওনিদ ইলিচ ব্রেঝনেভের জীবনাবসান ঘটে। সরকারী ভাবে মৃত্যুর কারণ ঘোষণা করা হয় করোনারী আর্টারী রোগের কারণে ঘটিত কার্ডিয়াক এরেস্ট (হৃদযন্ত্র থেমে যাওয়া)। এভাবে জীবন থেকে বিদায় নিলেন বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের অধিকারী, ১৯৬৪ সাল থেকে ক্ষমতায় অধিষ্টিত স্তালিনের পর সবচেয়ে দীর্ঘসময় সোভিয়েত দেশকে শাসন করা জনপ্রিয় নেতা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাপতি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল লিওনিদ ইলিচ ব্রেঝনেভ। সারাদেশ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নে নভেম্বরের ১২ থেকে ১৫ তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়। শোকার্ত জনতা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে হল অফ কলামসে রাখা প্রয়াত নেতার মরদেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ১৫ই নভেম্বর রেড স্কোয়ারে ক্রেমলিনের দেয়াল ঘেঁষে লিওনিদ ব্রেঝনেভকে সমাধিস্থ করা হয়।

ব্রেঝনেভের শাসনামল নিয়ে আগের পর্বগুলোতে আলোচন করেছি। কিন্তু এর বৈপরীত্য ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় এসে নিকিতা ক্রুশ্চেভ যে ধারার সূচনা করেন সেই আমলে। ক্রুশ্চেভ যে পথ বেছে নিয়েছিলেন তা ছিল ভুল, যে পথ পরিক্রমা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন নব্বুই এর দশকে বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়ায়। এ ধরনের ভুল চীনা সংস্কারক নেতা দেং শিয়াও পিং করেন নি, যে কারণে চৈনিক অর্থনীতির আকাশচুম্বী উল্লম্ফন ঘটেছে। চীনা নেতৃত্বের ফোকাস সব সময় থেকেছে অর্থনীতির ওপর। সমাজ-রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে তারা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন।

অর্থনীতিকে তারা সব সময় প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, যে পদ্ধতি কাজ দেবে বলে তারা মনে করেছেন, সেটিকে তারা নির্দ্বিধায় লুফে নিয়েছেন, আদর্শের কোন বাছ-বিচার ছিল না, বাইরের জগত টিপ্পনী কেটেছে, তাতে তারা কর্ণপাত করেন নি। চীনা নেতাদের উপলব্ধি ছিল অদূর ভবিষ্যতে, মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও, পূঁজিবাদের কবরে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই; বরং রয়েছে অফুরন্ত উদ্বোধনী ও সৃজনশীল শক্তি। তারা পূজিঁবাদকে ব্যবহার করে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যান। পুঁজিবাদ বিকাশের জন্য যা যা প্রয়োজন যেমন ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান, পুঁজিবাজার, মুদ্রানীতি, বিদেশী বিনিয়োগ ও পূঁজি প্রবাহ, অবকাঠামো নির্মাণ ও আধুনিকীকরণ, সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন, বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলা - এ সব কিছু তারা নিপুণ হতে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু সমাজ ও রাজনীতির জগতে তারা তাদের ইকোনমিক লিবেরালিজমকে ধারে কাছও ঘেঁষতে দেন নি, শক্তহাতে বজায় রেখেছেন কমিউনিস্ট পার্টির একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ। আদর্শিক চিন্তার জগতে বজায় রেখেছেন ধারাবাহিকতা: মার্কসবাদ, লেনিনবাদ- মাও সে তুং-এর চিন্তাধারা - দেং এর চিন্তাধারা। সব আমলের ঐতিহ্যকে ধারণ করেছেন, কোন কিছু যুগোপযোগী মনে না হলে তা চুপচাপ বাদ দিয়ে নতুন পথে হেঁটেছেন।
কিন্তু "খোলা জানালা", "বসন্ত" বা "পেরেস্ত্রোইকা" নাম দিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে কোন পূর্বসূরীকেই তারা নাকচ করে দেন নি। ১৯৮৯ সালে গর্বাচোভের প্ররোচনায় চীনা যুব সমাজ যখন বেইজিং-এর রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তখন পার্টির শীর্ষ নেতারা তিয়ানয়ানমেন স্কোয়ারে ট্যাংক চালিয়ে তা দমন করে দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এরপর নিরবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক অগ্রগতি উপহার দিয়ে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।
পক্ষান্তরে ক্রুশ্চেভ শুরু করেন পূর্বসূরী স্তালিনের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে নাকচ করে দিয়ে, এই প্রক্রিয়ার রুশ নাম ছিল "দেস্তালিনিজাৎসিয়া"। স্তালিনের মত একজন জননন্দিত নেতা, সোভিয়েত রাষ্ট্র গঠন ও এটিকে পরাশক্তি পরিণত করে যিনি পরিণত হয়েছিলেন মহীরুহে, তাকে প্রশাসনিক আদেশে ইতিহাস থেকে নির্বাসিত করা ছিল চরম ভুল।
ছাত্র জীবনের উন্নত ধাপে পদার্পণ করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও পাল্টে যায়। এখন আর প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে ক্লাসে যাওয়া ও ক্লাশ থেকে ফিরে হোমওয়ার্ক করার তাগিদ ছিল না। লাইব্রেরীতে বসে গবেষণা লিটারেচার পড়া এবং পট ও ফিল্ড এক্সপেরিমেন্টগুলো বসানো ও তত্বাবধান করা এবং সুপারভাইজারের সঙ্গে গবেষণার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা ছিল মূল কাজ। নিচের ছবিতে এ সময়কালের ছাত্রজীবনের চিত্র।

প্রথম বছরটি ছিল ঘটনাবহুল। লিওনিদ ইলিচ ব্রেঝনেভের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়ে আসেন তার মনোনীত উত্তরসূরী, দীর্ঘদিন কেজিবি প্রধান, ইউরি আন্দ্রোপভ। বয়স ৬৮ বছর হলেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট কর্মঠ এবং দেশ শাসনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার মত দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন (তুলনার জন্য ট্রাম্পের বয়স ৭৩, মোদির ৬৯, পুতিনের ৬৬)। দেশের কর্ণধার হওয়ার পর আন্দ্রোপভ তার সংস্কার কর্মসূচি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন। কোন একদিন রাত ন-টার টিভি সংবাদ ব্যুলেটিন "ভ্রেমইয়া"-য় প্রচারিত তার প্রথম ভাষণ আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনি। কিন্তু তিনি যা করতে চেয়েছিলেন, তার প্রেক্ষাপট অনুধাবন করার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হয় ক্রুশ্চেভের আমলে, যা নিয়ে আগে আলোচনা করেছি।

স্তালিনের সব স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলার পেছনে ক্রুশ্চেভ যে রাজনৈতিক শক্তি ব্যয় করেছেন, তা যদি চীনের দেং এর মত দৃঢ় চিত্তে অর্থনীতির সংস্কার ও আধুনিকায়নের দিকে নিবদ্ধ করতেন, তাহলে তার দেশের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত। তিনি ইচ্ছে করলে স্তালিনের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার অস্বীকার না করে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, যেমনটি মাও পরবর্তী যুগে দেং করেছিলেন, নতুন যুগের সূচনা করতে পারতেন। জোর করে ইতিহাসের পাতা কুয়াশাচ্ছন্ন করে দেয়া ও জনস্মৃতিতে ক্ষতের সৃষ্টি করা ক্রুশ্চেভের জন্য কোন রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড বয়ে আনে নি। কিন্তু তার শুরুটা সঠিক ছিল। অর্থনীতিতে সংস্কার তিনি শুরু করেছিলেন কৃষি খাত থেকে। রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষি পণ্যের সংগ্রহ মূল্য পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়, ১৯৫০-র শেষ দিকে এই মূল্য তিনগুণ বেড়ে যায়। ফলে বহুদিন পর দীর্ঘদিনের লোকসানী যৌথ খামারে কৃষি উৎপাদন লাভজনক লাভজনক কর্মকান্ডে পরিণতহয়। সংস্কারের পরিধি বিস্তৃত হয় সীমিত আকারের পারিবারিক শ্রমে পরিচালিত ব্যক্তি মালিকানাধীন আঙিনার কৃষিতেও (যৌথ খামারের প্রতিটি পরিবারের জন্য বরাদ্দ ছিল বাড়ীর পেছনে বেশ কিছু জায়গা যেখানে তারা শাকসব্জি ও ফলমূল চাষ এবং গবাদি পশু পালতে পারতেন।) আঙ্গিনায় উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যের ওপর ধার্য কর কমিয়ে দেয়া হয় এবং আঙিনায় চাষের জন্য বরাদ্দ প্লটের আকার পাঁচগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। ব্যক্তিমালিকানাধীন আঙিনার কৃষির দেশের খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৫৯ সালে দেশের মোট আবাদি জমির ৩ থেকে ৫ শতাংশ আঙিনার কৃষির আওতায় ছিল, কিন্তু প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে এর অবদান অনেক বেশি ছিল। একই বছর আঙিনার জমি থেকে উৎপাদিত হয় মোট দেশজ উৎপাদনের ৪৭% মাংস; ৪৯% দুধ এবং ৮২% ডিম। মোট উৎপাদিত আলুর ৬৫ শতাংশ, তাজা শাকসব্জির অর্ধেকেরও বেশী আসে আঙিনার কৃষি থেকে।

সামান্য সুযোগ পেয়েই ব্যক্তিখাতের কৃষি সমাজায়িত (কালখোজ) কৃষি থেকে উৎপাদনশীলতার মাপকাঠিতে অধিকতর কার্যকারিতার প্রমাণ রেখেছে। এর কারণ মালিকানার অনুভূতি। মানব সভ্যতার বিকাশে প্রাক-শিল্প যুগ থেকে শিল্প যুগে উত্তরণে বড় চালিকা শক্তি ছিল ব্যক্তিগত মালিকানা, যা সম্পদ সৃষ্টি ও এর দ্রুত প্রবৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা পালন করেছে। ঐতিহাসিকভাবে, উৎপাদন উপকরণের মালিকানা একজন ব্যক্তিকে তার শ্রম ব্যবহার করার জন্য একটি শক্তিশালী উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যতদূর সম্ভব অধিক পণ্য উৎপাদনে প্রণোদিত করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ধারায় রূপান্তরিত কর্মস্থলে "ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের" পরিবর্তে প্রাধান্য পায় "সমষ্টি", কারণ চূড়ান্ত লক্ষ্য সামাজিকীকরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু সমষ্টির পর্যায়ে মালিকানা বোধের উন্মেষ ঘটানো ও লালন করা এবং মালিকানার হাত ধরে উদ্যোক্তা হওয়ার যে স্পৃহা আসে তা সমষ্টি পর্যায়ে অনুশীলন করা মুখে বলা যতটা সহজ কাজের বেলায় ততটা নয়। কৃষিতে সামাজিক মালিকানার সীমাবদ্ধতা যখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, তখন ১৯৭৮ সালে চীনা নেতৃবৃন্দ পুঁজিবাদের উন্মেষ ঘটতে পারে এমন ঝুঁকি নিয়েও ১৯২০ সালে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে অনুসৃত নয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচির (নেপ) আদলে শুরু করেন সংস্কার কর্মসূচি, যার নাম দেয়া হয় "চীনা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সমাজতন্ত্র নির্মাণ"। এর শুরু হয় পর্যায়ক্রমে কৃষির বি-যৌথায়ন দিয়ে; সোভিয়েত মডেলের "জনগণের কমিউন"নামক সামাজিক মালিকানা ভেঙ্গে আবাদী জমি দীর্ঘমেয়াদি লিজে "হাউজহোল্ড রেসপনসিবিলিটি সিস্টেম" নামে কৃষক পরিবারগুলোর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এই পদ্ধতিতে কৃষকরা উৎপাদনের রাষ্ট্র নির্ধারিত কোটা পূরণ করে উদ্বৃত্ত নিজেদের কাছে রাখতে পারতেন। এটি ছিল কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে মনোযোগী হওয়ার জন্য বস্তুগত প্রণোদনা ও ছদ্মবেশে সমাজতান্ত্রিক শাসনের আওতায় কৃষিতে ব্যক্তিমালিকানা বিকাশের পথ সুগম করে দেয়া। যেমনটি আশা করা হয়েছিল, কৃষকরা এই প্রণোদনায় সাড়া দেন; সংস্কারের ফলাফল চীনা নেতৃবৃন্দের সব প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যায়। কৃষির সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে সংস্কার শিল্পখাতেও সম্প্রসারিত করা হয়। ক্ষুদ্র কলকারখানা ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়, আর্থিক খাতে সংস্কার শুরু হয় ও উপকূলীয় অঞ্চলে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য গড়ে ওঠতে শুরু করে বিশেষ ইকোনমিক জোন। আশির দশক থেকে সংস্কারের পালে হাওয়া যতই জোরদার হতে শুরু করে, ততই " চীনা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সমাজতন্ত্রের" চেহারা স্পষ্ট হতে শুরু করে। এটি ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণে পুঁজিবাদের বিকাশ যার পরিধি ততদূর বিস্তৃত হবে যতদিন পর্যন্ত না তা সমাজের ওপর পার্টির বজ্রমুঠির নিয়ন্ত্রণের প্রতি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। অন্য কথায় এটি কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক তত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, যে পুঁজিবাদের চালিকা শক্তি বাজার হলেও, তার ওপর রাষ্ট্রের খবরদারি ছিল, যাতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুফল নাগালে পেতে মানুষকে "ওপর থেকে নিচের দিকে চুইয়ে পড়া ও অতঃপর কাড়াকাড়ি করে" খাওয়ার ওপর নির্ভর না করতে হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভের শুরু করা সংস্কার অব্যাহত থাকলে ফলাফল চীনের মতই হতে পারত। কিন্তু গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তি-কৃষক চালিত খামার উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান বাড়তে দিলে পুঁজিবাদের উন্মেষ হতে পারে, এই ঝুঁকি মোকাবেলা করার মত সাহস ও দূরদর্শিতা তৎকালীন সোভিয়েত নেতৃত্বের ছিল না। তারা ১৯৫৮ সালেই সংস্কার কর্মসূচি গুটিয়ে ফেলেন। ক্রুশ্চেভ স্তালিনের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে নাকচ করে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু অর্থনীতিতে তার হাতে গড়া কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতির মডেলটিকেই ঘষে-মেজে চালিয়ে যাওয়ার পথ বেছে নেন। এটি ছিল বিশাল ভুল এবং এ ভুলটি করে পরবর্তীতে সোভিয়েত অর্থনীতিকে আটকে দেয়া হয় নিম্ন প্রবৃদ্ধি ও বন্ধ্যাত্বের ফাদেঁ। অথচ ভূ-রাজনৈতিক খেলায় নিজেকে শক্ত অবস্থানে রাখার জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে নতুন পথ খোঁজা সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য জরুরী ছিল। পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের

অভ্যুদয় ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এবং এই শক্তির জোরে প্রায় অর্ধেক ভূ-ভাগ নিজের প্রভাব বলয়ে টেনে নিয়ে আসায়। অপর পরাশক্তির সঙ্গে স্নায়ু যুদ্ধে পাল্লা দিয়ে এই বিশাল সাম্রাজ্য নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যে গতিতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন প্রয়োজন ছিল, তা করতে ক্রুশ্চেভ সহ স্তালিন-পরবর্তী সব সোভিয়েত নেতাই ব্যর্থ হন। এতে অর্থনীতিতে রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং অর্থনীতির ভিত ধীরে ধীরে দূর্বল হয়ে পড়েছে। নিকিতা ক্রুশ্চেভ যদি তার শুরু করা সংস্কার থেকে পিছু না হটে চীনের মত সীমিত আকারে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় পূঁজিবাদের বিকাশ ঘটাতেন এবং এটিকে যতদিন পর্যন্ত না সামাজিক মালিকানার কার্যকর কাঠামো উদ্ভাবন করা গেছে ততদিন পর্যন্ত সামগ্রিক অর্থনীতির চালকের আসনে রাখতেন, অর্থাৎ পূঁজিবাদের উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহার করে সমাজতন্ত্র নির্মাণে ব্রতী হতেন, তাহলে মার্কসবাদের প্রতি কি খুব বেশি বিশ্বাসঘাতকতা করা হতো? এর উত্তর "না" এবং এর জন্য আমাদের আবার ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের কাছে ফিরে যেতে হয়। তাঁর পরিষ্কার উপলব্ধি ছিল, রাশিয়াতে বিপ্লব এসে যায় সময়ের বহু পূর্বে। রাশিয়ায় পূঁজিবাদ যে ধারায় বিকশিত হচ্ছিল,তাতে লেনিন ভেবেছিলেন, তার জীবদ্দশায় বিপ্লব আসবে না, এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরো এক প্রজন্ম। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত রুশ সাম্রাজ্যে গণরোষের মুখে যখন জারতন্ত্র ভেঙে পড়ে, তখন যে বিপ্লব পরিস্থিতির সৃষ্ট হয়, তা হাতছাড়া করতে লেনিন রাজি ছিলেন না।

বিপ্লবের পর পরই বলশেভিক সরকারকে মুখোমুখি হতে হয় সবচেয়ে বড় প্রশ্নের: সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্মাণের পূর্বশর্ত হিসেবে উৎপাদন উপায়সমূহের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা। এ জন্য লেনিনের প্রস্তাবনা ছিল "জাতীয়করণের", কিন্তু তাঁর জাতীয়করণের ধারণায় সম্পদের সরাসরি জব্দকরণ ছিল না। লেনিনের চিন্তায় জাতীয়করণের উদ্দেশ্য পূঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা ছিল না।বরং এটি ছিল জাতীয় পর্যায়ে এই সম্পর্কগুলো এমনভাবে একীভূত করা যাতে করে পূঁজির ওপর শ্রমিক শ্রেণীর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়, অন্য কথায় শ্রমিক শ্রেণীর নজরদারিতে পূঁজিবাদী ব্যবস্থার সম্পর্কগুলো চলমান থাকবে। কিন্তু বিপ্লবের পর পরই সময়গুলো ছিল এত কঠিন এবং ঘটনাবলী এত দ্রুত আবর্তিত হচ্ছিল যে বলশেভিক নেতৃত্বের পক্ষে ধীরে ও সন্তর্পনে এগিয়ে চলা অসম্ভব ছিল। তাই খুব দ্রুত জোর জবরদস্তি ও জব্দকরণের মাধ্যমে কলকারখানা ও ভূমি সহ ব্যক্তিমালিকানাধীনসম্পত্তি জাতীয়করণ করে তার ওপর শ্রমিক ও কৃষকদের একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করা হয়। সোভিয়েত ইতিহাসে এই অধ্যায়টি "ওয়ার কমিউনিজম" নামে অভিহিত হয়ে আছে। শ্রমিক-কৃষকদের ব্যবস্থাপনায় অনভিজ্ঞতা ও অদক্ষতার কারণে বিপ্লব-পরবর্তী রুশ অর্থনীতিতে সংকট ঘনীভূত হতে শুরু করে। অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে জাতীয়করণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার ফলে শিল্প উৎপাদনে ধ্বস নামে এবং অর্থনীতি সংকুচিত হয়ে পড়ে। এর প্রতিকার হিসেবে লেনিনের নেতৃত্বে ১৯২১ সালে চালু করা হয় "নতুন অর্থনৈতিক নীতি (নেপ)"। আগের পর্বগুলোতে এটির ওপর বিশদ আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে এটি ছিল পূঁজিবাদকে আংশিকভাবে ফিরিয়ে আনা। এই কৌশলগত পশ্চাদপসরণ এটাই স্বীকার করেছে যে, মানুষের চেতনা থেকে ব্যক্তি-মালিকানা বোধ মুছে দেয়া; পূঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে তার জায়গায় উন্নততর বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা কত কঠিন।১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিন "নেপ কর্মসূচিতে" সমাপ্তি টানেন এই যুক্তি দেখিয়ে যে দীর্ঘদিন চলতে দিলে পূঁজিবাদের প্রসার ঘটতে পারে এবং বলশেভিক পার্টি ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে। তখনকার চলমান রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে এ আশংকা একেবারে অমূলক ছিল না।

কিন্তু ১৯৫০-এর দশকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির একচ্ছত্র আধিপত্য চ্যালেঞ্জ করার মত কোন শক্তি দেশটিতে ছিল না, ক্রুশ্চেভের পক্ষে তার সংস্কার কর্মসূচি অব্যাহত রাখা অসম্ভব ছিল না। এবং এ ধরনের সংস্কার অব্যাহত রাখার জন্য বস্তুগত পূর্বশর্তগুলো বিরাজ করছিল। কৃষি খাতকে ব্যবহার করে অর্থাৎ কৃষিতে অর্জিত সুফল কৃষিতে ব্যবহার না করে তা দিয়ে দেশের শিল্পায়ন ও নগরায়নকে ত্বরান্বিত করার সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির যে কৌশলগত অভীষ্ট ছিল তা ১৯৫০-র মাঝামাঝিতেই অর্জিত হয়ে যায়। তখন ছিল সময় কৃষি খাত থেকে উন্নয়ন সম্পদ আহরণ বন্ধ করে, কৃষির উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করে এই খাতকে তার নিজস্ব যোগ্যতায় অর্থনীতিতে অবদান রাখার রাখার জন্য ওপরে টেনে তোলা। নেতা হিসেবে যদি দূরদর্শী হতেন, তা হলে ক্রুশ্চেভের প্রয়োজন ছিল কমিউনিস্ট পার্টির পুরো নেতৃত্বকে তার সংস্কার কর্মসূচির প্রতি রাজনৈতিকভাবে অংগীকারাবদ্ধ করানো লেনিন অনুসৃত "নয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচি" চলাকালীন অর্জিত অভিজ্ঞতার ঝুলির দিকে অঙ্গুলি হেলন করে।কট্টর মার্কসবাদীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য তিনি ইচ্ছে করলে নতুন টার্ম উদ্ভাবন করতে পারতেন যেমন "কমিউনিজমে উল্লম্ফনের লক্ষে পরিপক্ক সমাজতন্ত্র নির্মাণ"।

আমার সুপারভাইজার প্রফেসর আলেকসান্দর স্মিতানিনের নিবিড় তত্ত্বাবধানে গবেষণার কাজ এগিয়ে চলে।

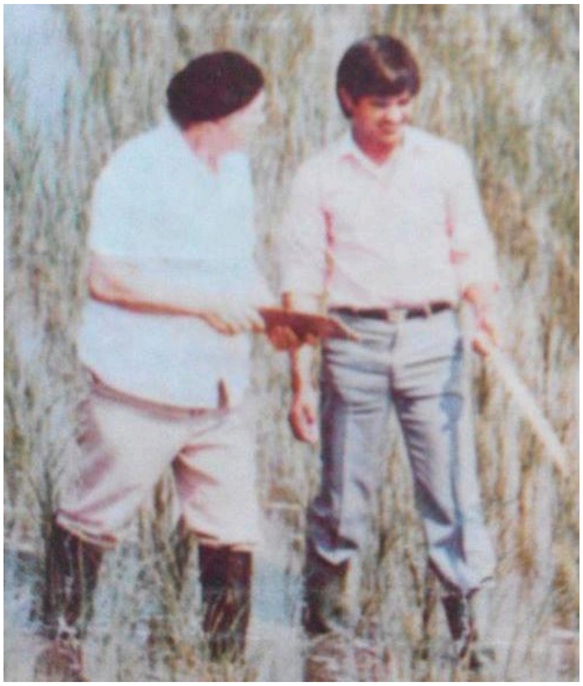

আগের পর্বটিতে ক্রুশ্চেভের কৃষি সংস্কার নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পর্বটি তারই ধারাবাহিকতা। নিকিতা ক্রুশ্চেভ যদি সময়ের চ্যালেঞ্জের উর্ধে ওঠে তার শুরু করা কৃষি সংস্কার অব্যাহত রাখতেন, তাহলে চিত্রটি কেমন হতে পারত ? প্রথমেই বলা যায়, রাশিয়ায় উদ্যম আর স্পৃহা-চালিত কৃষক-ভিত্তিক গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটানো সম্ভব হত, যেমনটি চীন সফলভাবে করেছে। কৃষি যৌথায়নের পর দুদশক পেরিয়ে গেলেও তখনো কৃষক পরিবার-চালিত কৃষি উৎপাদনের স্মৃতি জনমানসে ছিল । গ্রামীণ আয় শহরাঞ্চলের আয়ের চেয়ে নিম্নে ছিল এবং কঠোর শ্রম ও কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার করে আয় বৃদ্ধির যে কোন সুযোগ কৃষকরা লুফে নিত। সরকারের তরফ থেকে সঠিক নীতি ও উপকরণ সহায়তা পেলে যৌথ খামারিদের, যারা প্রকৃত পক্ষে ছিল কৃষি শ্রমিক, সত্যিকারের কৃষকে রুপান্তর করা সম্ভব হত। পরবর্তী পদক্ষেপ হতে পারত, বিশাল যৌথ খামার (১৯৬০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি যৌথ খামারে গড়পড়তা জমি ছিল ২,৭৪৫ হেক্টর; পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্রে একটি বাণিজ্যিক ফার্ম ছিল ১২২.৬ হেঃ) ভেঙে ছোট ছোট খামারেপরিণত করে তার আওতায় আবাদি জমি কৃষক পরিবারগুলোর কাছে দীর্ঘমেয়াদি লিজের আওতায় হস্তান্তর করা। এই ব্যবস্থাটিকেও রাষ্ট্রীয় মালিকানায় জনগণের সম্পত্তি হিসেবে চালিয় দেয়া যেত। যৌথ খামারগুলোর মতই লিজের আওতায় কৃষক পরিবারের কাছে হস্তান্তরিত খামারগুলোর জন্যও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা যেত এবং তাদের লক্ষমাত্রা পূরণের পর উদ্বৃত্ত নিজেদের কাছে রেখে দেয়ার স্বাধীনতা দেয়া যেত।

এ ধরনের আধা ব্যক্তি-মালিকানার নাম দেয়া যেত "যৌথ খামার উৎপাদনের বস্তুগত প্রণোদনা" যাতে করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। ছোট আকারের উৎপাদন ইউনিটগুলো অর্থনীতির আকৃতির সঙ্গে দক্ষতার নিয়ম মেনে উৎপাদন উপকরণ ও আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারত; সর্বোপরি তাদের সুযোগ থাকত নিজেদের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কোন জমিতে কোন শস্য আবাদ করে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার করা যায়, তা নিশ্চিত করা। কৃষি অর্থনীতিকে যদি ক্রমান্বয়ে উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতার পথে আসীন করা হত এবং খাদ্য উৎপাদনের দায়িত্ব কৃষকদের কাছে ছেড়ে দেয়া হত, তাহলে জনগণের খাদ্য জোগানের সরাসরি ভার রাষ্ট্র ও পার্টি নেতৃত্বের ওপর থেকে নেমে যেত। তারা কৌশলগত চিন্তায় (স্ট্রাটেজিক থিংকিং) অধিক সময় ক্ষেপণ করতে পারতেন। আয় বর্ধনের সুযোগ কৃষকদের ভেতর তাদের শ্রমে অর্জিত ফলাফলে সত্যিকারের আগ্রহ সৃষ্ট করত, যার জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতির কান্ডারীরা বহু চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সাফল্যের মুখ দেখেন নি। এভাবে পর পর কয়েক বছর কৃষকরা রাষ্ট্রের কোটা পূরণ করে দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য জোগান দিতে সফল হলে, পরবর্তী বড় পদক্ষেপ হতে পারত সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে যৌথ খামার ব্যবস্থাকে (কালখোজ) অধিক উৎপাদনশীল বাণিজ্যিক খামার ব্যবস্থায় রুপান্তরের পথ সুগম করে দেয়া। যেহেতু কৃষি খাতকে কয়েক দশক ধরে ব্যবহার করা হয়েছিল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার স্বার্থে; ১৯৬০-র দশকটি ছিল তার উল্টোটি করার – যন্ত্র নির্মাণ শিল্পকে ব্যবহার করে কৃষি যন্ত্রায়ন ও কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের যন্ত্রায়নকে ত্বরান্বিত করা। যদিও জমি কর্ষণের জন্য ট্রাক্টর ও ফসল মাড়াইয়ের জন্য কম্বাইন পর্যাপ্ত ছিল, অর্থকরি ফসল, প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদন ও কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহার্য্য বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি অপ্রতুল ছিল। কৃষি-ভিত্তিক এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিশাল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এর বিকাশে তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয় নি। সংক্ষেপে, সোভিয়েত নেতৃত্ব যৌথায়িত কৃষির কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলো অপসারণের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় সংস্কার শুরু করার সঠিক মূহূর্তটি হাতছাড়া করেন এবং ভবিষ্যতের অর্থনীতির ভিত দূর্বল হওয়ার পথ সুগম করে দেন।

দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দেয়ার পেছনে কাজ করেছে সোভিয়েত নেতৃত্বের রাজনৈতিক অহমিকা।
১৯৫০ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যুদয় ঘটে পরাশক্তি হিসেবে যার প্রভাব বলয়ে ছিল বিশ্বের প্রায় অর্ধেক। সরাসরি রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণে ছিল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির, নৈতিক সমর্থন আসত তৃতীয় বিশ্বের জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন থেকে ও বিশ্বজুড়ে গড়ে ওঠা অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ছিল রাজনৈতিক গুরু। এই বিশাল সাম্রাজ্যের নেতা হিসেবে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি ঘটানোর মত মানসিকতা তাদের ছিল না। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন (যা চীনা নেতৃত্বের মাথায় সবসময় থেকেছে) এর জন্য যদি আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটাতেন, তাহলে কি আদর্শের সঙ্গে সত্যি বিশ্বাসঘাতকতা হতো? খুব সম্ভব না। মার্কসের তত্বে বলা আছে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাবে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী (শিল্প শ্রমিক)। তিনি গ্রামীণ কৃষককে প্রলেতারিয়েত হিসেবে গণ্য করেন নি এবং তাদের শিল্প শ্রমিকদের স্বাভাবিক মিত্র হিসেবে গণ্য করতেন না। কিন্তু বিংশ শতকের শুরুতে রুশ সাম্রাজ্যের বিরাজমান বাস্তবতার আলোকে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন কৌশলের আশ্রয় নেন । তখন রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশে সবেমাত্র পূঁজিবাদের বিকাশ শুরু হয়েছে; বিশাল এই দেশটি তখন ছিল কৃষি-নির্ভর, গ্রামীণ জীবনে ছিল ভূ-স্বামী ও সামন্ত প্রথার দাপট। ছিল না আধুনিক শিল্প কলকারখানা এবং এসব কেন্দ্র করে সুসংঘঠিত শ্রমিক শ্রেণীর উপস্থিতি। কাজেই বিপ্লবে শামিল হওয়ার জন্য সর্বহারাদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষক শ্রেণীতে বিভাজন টানা হয়। দরিদ্র ভূমিহীন

কৃষকদের বিত্তশালী ও জমিদার-শ্রেনীর কৃষকদের থেকে আলাদা করে শিল্প শ্রমিকদের সহযোদ্ধা হিসেবে দাঁড় করানোর কৌশল নেয়া হয়। কিন্তু শ্রমিক কৃষকদের এই জোট ছিল মূলতঃ বিপ্লব ঘটানো ও বিপ্লব-পরবর্তী ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বলশেভিক পার্টির সাময়িক কৌশল, এর উপযোগিতা কিছুদিন পরই শেষ হয়ে যায়। অতএব শহর এবং গ্রামে একই ধরনের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন আদর্শগত বাধ্যবাধকতা ছিল না। যখন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার শীর্ষে ছিল, তখন সীমিত ব্যক্তি মালিকানায় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলন করলে গ্রামীণ বুর্জোয়া শ্রেনীর উদ্ভব ঘটার সম্ভাবনা থাকলেও, তা মূলধারার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতি হুমকি হত না। বরং অধিক উৎপাদনক্ষম কৃষি ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পায়ন অর্থনীতিতে অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধ যোগ করে অর্থনীতির উন্নয়নের ধারাকে চাঙ্গা রাখতে পারত।

এরপর ক্রুশ্চেভের বাকী সময় এবং ব্রেঝনেভের পুরো আমল কেটেছে স্তালিনের পরিকল্পিত অর্থনীতির মডেলটিকে উদারীকরণ এবং সামাজিক দায়বোধ জাগ্রত রাখার পরিবর্তে ব্যক্তি স্বার্থের বোধকে উসকে দেয়ার জন্য "বস্তুগত প্রণোদনা (মাতেরিয়ালনায়া জাইনতেরেসোভান্নস্ত)" নামে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনায় সীমিত কিছু কাঠামোগত সংস্কার করে। কিন্তু এ ধরনের "দোটানা" অর্থনীতি কাঙ্খিত ফল দিতে ব্যর্থ হয়; কারণ পরিকল্পিত অর্থনীতি উদারীকরণের কারণে তার মূল চালিকাশক্তি হারিয়ে ফেলে, অন্যদিকে বস্তুগত প্রণোদনা সমূহ আশানুরূপ কাজ করে নি বাজার অর্থনীতির অন্যান্য শর্তসমূহের অনুপস্থিতির কারণে। ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শ্লথ হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সামরিক রণসজ্জা ও মহাকাশ গবেষণা; সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলোকে ভর্তুকি প্রদান; উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে টিকিয়ে রাখা; আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালনের নামে যেখানেই সুযোগ এসেছে সেখানেই বিপ্লব রফতানী করার চেষ্টা, এসবের পেছনে সম্পদ ব্যয় করে, যেটুকু নিজের জনগণের জন্য অবশিষ্ট থাকত তা ধীরে ধীরে চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হয়ে পড়ে। এর ফলশ্রুতিতে সমাজ জীবনে নানা নেতিবাচক প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়: ইউরি আন্দ্রোপভের শাসনকাল

দীর্ঘদিন কেজিবি প্রধান হিসেবে কাজ করার সুবাদে নব নির্বাচিত নেতা ইউরি আন্দ্রোপভ সোভিয়েত রাষ্ট্রের সামনে যে সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই ইউরি আন্দ্রোপভ শুরু করেন তার সংস্কার কর্মসূচি। প্রথম পদক্ষেপ ছিল দূর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান এবং অর্থনীতি পরিচালনায় শৃঙ্খলা ও জবাবদিতা ফিরিয়ে আনা। তখন দেশের খুব কম লোকই জানতেন, পার্টির নতুন সম্পাদকও তার পূর্বসূরির মত নানাবিধ ব্যধিতে আক্রান্ত। কারণ আন্দ্রোপভের চালচলনে তার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার মত কিছু চোখে পড়ত না। সংস্কার কর্মসূচি এগিয়ে নিতে তার গতিশীল ও দৃঢ় নেতৃত্ব মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও দেশের উজ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী করে তোলে। কিন্তু মানুষের এই আশাবাদ বেশিদিন টিকে নি। ১৯৮৩-র গ্রীষ্মকাল থেকে নতুন নেতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে এবং এ সময় তাকে কদাচিৎ জনসমক্ষে দেখা যেত। ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে আন্দ্রোপভ মস্কোর সেন্ট্রাল ক্লিনিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিতেন। হাসপাতাল থেকে আন্দ্রোপভের আর বাড়ী ফেরা হয় নি, ১৯৮৪ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তার জীবনাবসান ঘটে। রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে আন্দ্রোপভের হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়ায় চলমান সংস্কার কর্মসূচি থমকে যায় এবং একই সঙ্গে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে যায়। এরপর দেশের নেতা হিসেবে আবির্ভাব ঘটে কনস্তানতিন চেরনেনকোর; ৭২ বছর বয়সের ভারে নুব্জ্য এই নেতাও নানাবিধ ব্যাধিতে ভুগছিলেন। জনগণকে অনুপ্রাণিত করার মত কোন ক্যারিশমা তার ছিল না; সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার ক্ষমতা গ্রহণ ছিল সাময়িকভাবে শূন্যস্থান পূরণ করার মত। তার শাসনকাল আন্দ্রোপভের চেয়েও স্বল্পস্থায়ী ছিল; মাত্র ১৩ মাস ক্ষমতায় থেকে তার মৃত্যু হয়। চেরনেনকোর মৃত্যু একটি যুগের অবসান ঘটায়; রাজনীতির অঙ্গন থেকে বিদায় নেন জরা ও ব্যধিতে আক্রান্ত দ্বিতীয় প্রজন্মের জ্যেষ্ঠ নেতারা।
আন্দ্রোপভের মৃত্যুর পর থেকেই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোতে আগামী দিনের নেতা নির্বাচনে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকে; চেরনেনকোর মৃত্যুতে রাজনীতির মাঠ খালি হয়ে যায় তৃতীয় প্রজন্মের অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতাদের জন্য। জনগণেরও আকাঙ্খা ছিল বলিষ্ঠ নেতৃত্বের, যিনি আন্দ্রোপভের শুরু করা সংস্কারগুলোকে এগিয়ে নেবেন। এই ক্ষমতার লড়াইয়ে পলিটব্যুরোতে তার চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ ও যোগ্য নেতাকে টপকে যিনি ওপরে উঠে এলেন তিনি ছিলেন ৫৪ বছর বয়সী পলিটব্যুরোর সর্বকনিষ্ঠ সদস্য মিখাইল সের্গেইয়েভিচ গর্বাচোভ। ১৯৮৫ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী প্লেনারি সভায় মিখাইল গর্বাচোভকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। লিগাচোভ, রিঝকভ, রোমানভ, শেরবিৎস্কি-দের মত অভিজ্ঞ নেতাদের

পাশ কাটিয়ে সর্বকনিষ্ঠ একজনকে নেতা হিসেবে নির্বাচন করা ছিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। কিন্তু এটি ছিল বিশাল ভুল এবং এ ভুলের মাশুল গুনতে হয়েছে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিলুপ্তির মাধ্যমে।
খুব সম্ভব ১৯৮৪ সালে আমরা দল বেঁধে শৈলশহর সোচিতে বেড়াতে যাই। নিচের ছবিগুলোতে তার কিছু স্মৃতি

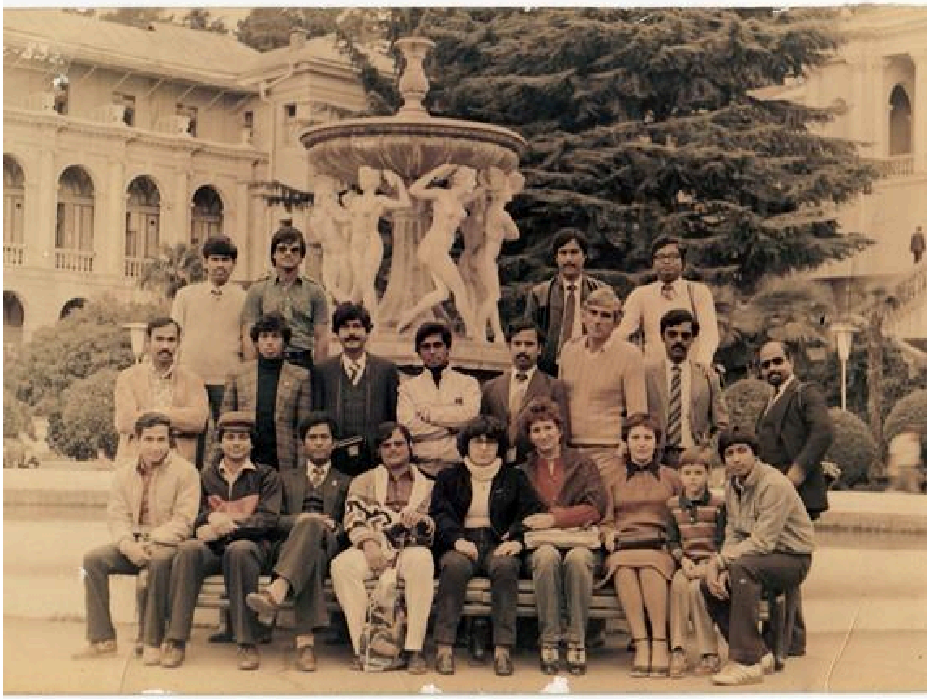

পিএইচডি গবেষণার অগ্রগতি

১৯৮৪ সালের মাঝিমাঝি থেকে পিএইচডি থিসিস লেখায় হাত দেই। এর জন্য প্রাসঙ্গিক গবেষণা তথ্য (লিটারেচার রিভিউ) সংগ্রহের জন্য দিনের অধিকাংশ কাটাতে হত লাইব্রেরীতে বই, বিভিন্ন গবেষণা পত্র ও বৈজ্ঞানিক জার্নাল পড়ে। ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরীতে রুশ ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিতেও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জার্নাল সহজলভ্য ছিল। কোন প্রয়োজনীয় গবেষণা প্রবন্ধ লাইব্রেরীতে পাওয়া না গেলে রিকুইজিশন দেয়ার ব্যবস্থা ছিল মস্কোতে অবস্থিত All-Union Institute of Scientific and Technical Information at the USSR Academy of Sciences -এ (Всесоюзный институт научной и технической информации Академии Наук СССР,ВНИИТИ)। সপ্তাহ দুয়েকের মাঝে কাঙ্খিত প্রবন্ধের রিপ্রিন্ট পেয়ে যেতাম। আমার গবেষণার ক্ষেত্র ছিল হাইব্রিড রাইস ব্রিডিং। ১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে চীনা বিজ্ঞানীরা হাইব্রিড রাইস প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ঘোষণা দিলে সারা বিশ্বে তা কৃষি গবেষণায় সম্পৃক্ত বিজ্ঞানী মহলে ব্যাপক কৌতুহলের সৃষ্টি করে। লাইব্রেরীতে একদিন একটি জার্নালের পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ নজরে আসে একটি প্রবন্ধের নাম " CIA assessment of hybrid rice technology invented in China".ধরেই নিয়েছিলাম পাওয়া যাবে না, তবুও রিপ্রিন্টের জন্য মস্কোতে রিকুইজিশন পাঠালাম।

অবাক করে দিয়ে রিপ্রিন্ট ঠিকই এসে গেল। ১৯৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে চীনাদের উদ্ভিদ প্রজননে নাটকীয় অগ্রগতি আমেরিকাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে কিনা এই ভেবে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে (সিআইএ) সরকার দায়িত্ব দেয় হাইব্রিড ধান প্রযুক্তিটি আনুপূর্বিক খতিয়ে দেখার জন্য। এই প্রবন্ধটি ছিল সিআইএর সেই অনুসন্ধান রিপোর্ট। সিআইএ এনালিস্টরা অভিমত দেন হাইব্রিড ধান কোন ব্রেক-থ্রু প্রযুক্তি নয়, অর্থাৎ এটি কোন বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে নি। প্রচলিত আধুনিক জাতের ধানের চেয়ে হাইব্রিড ধান গড়ে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ অধিক ফলন দেয়। তারা হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের ব্যয়বহুল, জটিল ও শ্রমসাধ্য কৌশলের দিকে আলোকপাত করে অভিমত দেন চীনের বাইরে এই প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তারের তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। এরপর পেরিয়ে গেছে প্রায় অর্ধ শতাব্দী, কিন্তু হাইব্রিড ধান সম্পর্কে সিআইএ এনালিস্টদের করা ভবিষ্যৎবাণী অকাট্য প্রমাণিত হয়েছে। লিটারেচার রিভিউ করার পাশাপাশি চলে গবেষণালব্ধ তথ্যাদি প্রক্রিয়াজাত করার কাজ।

১৯৮৫ সাল এসে যায়। ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়েছেন তরুণ, সপ্রতিভ ও প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য মিখাইল গর্বাচোভ । অনেকদিন পর বয়সের ভারে নুব্জ্য ও নানা জটিল দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত নেতাদের বিদায়ের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ বেজায় খুশি; তারা আশায় বুক বাঁধে নতুন নেতা আন্দ্রোপভের শুরু করা সংস্কার কর্মসুচি এগিয়ে নেবেন (গর্বাচোভ ছিলেন আন্দ্রোপভের প্রিয়পাত্র , তারই আনুকূল্যে গর্বাচোভ তর তর করে ক্ষমতার শীর্ষে ওঠে আসেন)। তার স্ত্রী রাইসা মাকসিমোভনা ছিলেন সমানে সমান; মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ছাত্রী তার এক বছরের অগ্রজ, অত্যন্ত সুদর্শনা, সপ্রতিভ ও ফ্যাশন-সচেতন। পশ্চিমী প্রচার মাধ্যমগুলোতে ধূম পড়ে যায় মিশা (মিখাইলের সংক্ষিপ্ত নাম)-রাইসা দম্পতির বন্দনায়। দেশের মানুষ তখন ঘূণাক্ষরেও টের পায় নি যে ঈশান কোণে মেঘ জমতে শুরু করেছে। যিনি ক্ষমতায় এসেছেন তিনি বিশ্বাসঘাতক, পশ্চিমাদের এজেন্ট, গোপন এজেন্ডা ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করা।

এ সময় আমি ব্যস্ত থাকি থিসিস লেখা, টাইপ করিয়ে আনা, তারপর সুপারভাইজারকে দেখানো ও ভুল সংশোধন করা, এ সব করে। প্রায় বিকেল অনুজদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটত; একেবারে নতুন মুখ ছিল রিবেল, ফিরোজ, অনুপমা। নিচের ছবিতে বাঁ থেকে খলিল, আমি, রিবেল, শ্যামল, মাসুদ, ফিরোজ, অনুপমা ও শ্রীলঙ্কার মেয়েরা।

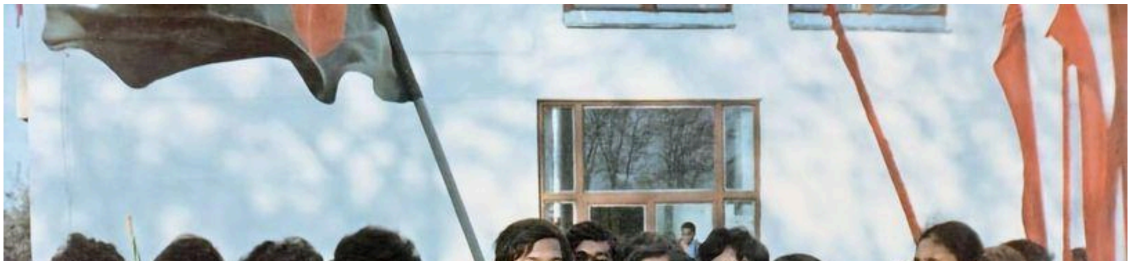

এ সময়কালের আরো দুটি ছবি: উপরের ছবিতে বাঁ দিক থেকে মাসুদ, সমীরণ দা (ডা: সমীরণ সাহা), আমাদের শিক্ষক ভাদিম, আমাদের সুপারভাইজার প্রফেসর স্মিতানিন, মাস্টার্স প্রোগ্রামে আমার কো-গাইড প্রজনন বিভাগের অধ্যাপক ভ্যালেন্তিনা

ভাসিলিয়েভনা এফরেমভা, আমি, জহর ও শ্যামল। নিচের ছবিতে বাঁ থেকে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের শিক্ষক প্রফেসর নিকোলাই স্তেপানোভিচ তুর, জয়নাল, আমি, মাসুদ (ড: মাসুদুর রহমান, মহাপরিচালক বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট), আমাদের অনুষদের উপ-ডিন মিখাইল লুকামেৎস, তারপর দেবাশীষ ও ফিরোজ।

কিছুদিনের মধ্যে এদের ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে বিষন্ন বোধ করতাম। পিএইচডি থিসিসের খসড়ার ওপর রিভিউয়াররা যে সব মন্তব্য করেছিলেন, তা বিবেচনায় নিয়ে থিসিসটি চূড়ান্ত করি। ১৯৮৫ সালের গ্রীষ্মের ছুটি এসে যায়। আমার সুপারভাইজার প্রফেসর আলেকসান্দর স্মিতানিনের সুপারিশক্রমে ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কাউন্সিল আমার থিসিস ডিফেন্সের তারিখ নির্ধারণ করে ১৯৮৫-এর সেপ্টেম্বরের কোন এক দিন। নামে থিসিস ডিফেন্স হলেও এটি অভিজ্ঞ প্রফেসরদের জেরা মোকাবেলা করা। আমার মূল এক্সটার্নাল একজামিনার ছিলেন মস্কো প্যাট্রিস লুমুম্বা গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের শস্য উৎপাদন বিভাগের একজন প্রবীণ অধ্যাপক। নির্ধারিত দিনে একাডেমিক কাউন্সিল জড়ো হয় আমার পরীক্ষা নেয়ার জন্য (নিচের ছবি)।

শুরুতে আমার সুপারভাইজার থিসিসের গবেষণা বিষয়বস্তু উত্থাপন করে আমার গবেষণা কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন (নিচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে)। এরপর আমাকে ডাকা হয় থিসিসটি ডিফেন্সের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করা ও একাডেমিক কাউন্সিল সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য (নিচের ছবি) ।

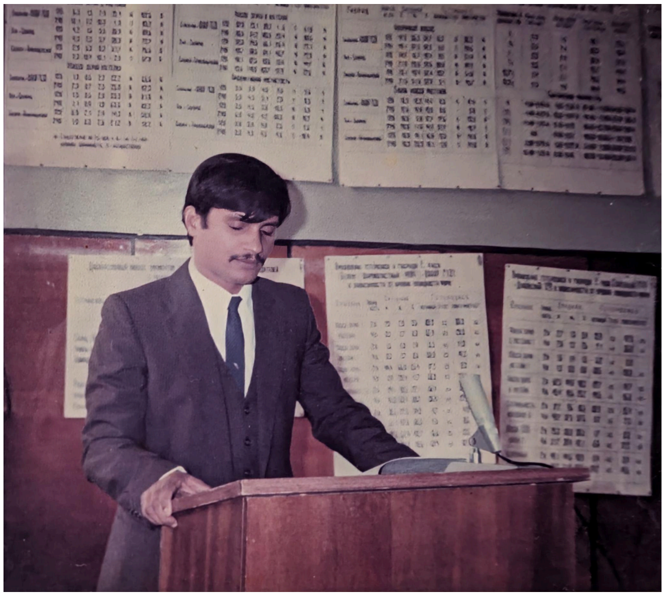

কৃতিত্বের সঙ্গে ডিফেন্স শেষ যায়; একাডেমিক কাউন্সিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম এটেস্টেশন কমিশনের কাছে আমাকে পিএইচডি ডিগ্রী দেয়ার সুপারিশ করে। কাছাকাছি সময়ে খলিলের ডিফেন্সও শেষ হয়; সুবাসদার তার আগেই শেষ হয়ে যায়। এবার পাকাপাকিভাবে ছাত্রজীবনের ওপর পর্দা নেমে আসে; পড়ার ধান্ধা করে মূল্যবান সময় কাটানোর বিলাসিতা শেষ হয়ে যায়। এরপর আমরা আলোচনায় মগ্ন থাকতাম দেশে ফিরে কি করব।
শেষবারের মত ১৯৮৫-এর ৭ই নভেম্বর অনুজদের সঙ্গে মহান অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপনে অংশ গ্রহণ করি। গর্বাচোভ ততদিনে তার পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত কর্মসূচির সূচনা করতে যাচ্ছেন।

শেষ হয়ে যায় ১৯৮৫ সাল, ১৯৮৬-এর নববর্ষ আমাদের জন্য ছিল শেষ নববর্ষ বরণ। টিভিতে গর্বাচোভের নববর্ষের ভাষণ শুনে এবং অনুজদের সঙ্গে ওয়াইন ও বিয়ারের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে নববর্ষের রাত পার হয়ে যায়।

মার্চের প্রথম সপ্তাহে হাতে আসে দীর্ঘপ্রতীক্ষিত সনদ, ডিগ্রীর নাম Doctor of Philosophy in Agriculture (Plant Breeding and Seed Production) । (নিচের ছবি)

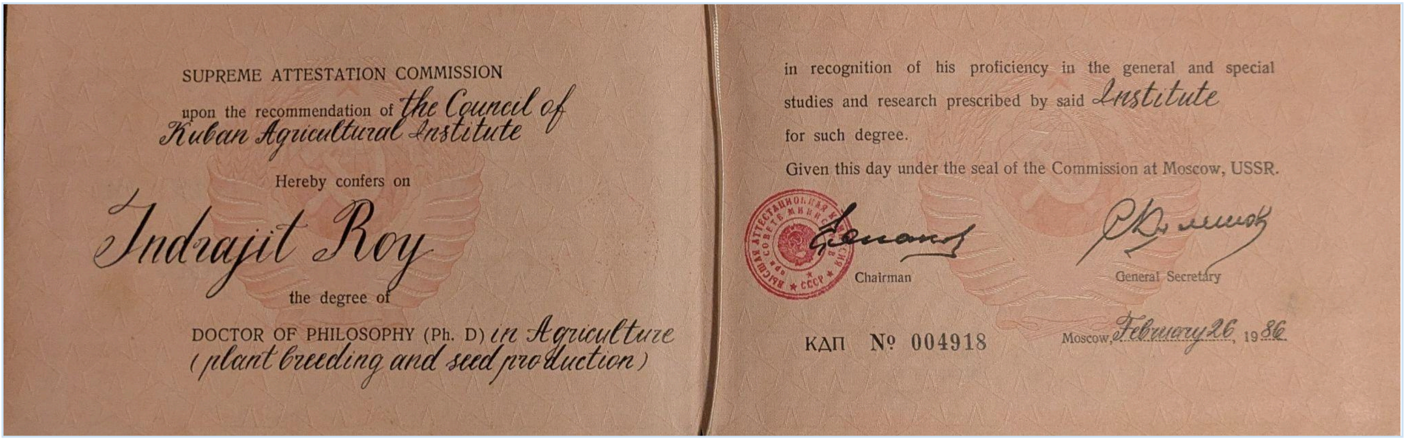

SUPREME ATTESTATION COMMISSION
upon the recommendation of the Council of Kuban Agricultural Institute
Hereby confers on
Indrajit Roy
the degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph. D) in Agriculture (plant breeding and seed production)

in recognition of his proficiency in the general and special studies and research prescribed by said Institute for such degree.
Given this day under the seal of the Commission at Moscow, USSR.

Chairman

General Secretary

КДП № 004918

Moscow, February 26, 1986

এরপর ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ আমাদের হাতে দেশে ফেরার টিকিট ধরিয়ে দিতে বিলম্ব করেন নি। আমি আর খলিল একই সঙ্গে দেশে ফেরার প্রস্তুতি নেই। শীত শেষ হয়ে সবে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। ১৯৮৬-এর এপ্রিলের শুরুতে কোন এক ভোরে আমাদের বিদায়ের মূহুর্ত চলে আসে। আমাদের অনুজদের গভীর আলিঙ্গনে সিক্ত হয়ে অশ্রুসজল চোখে আমি ও খলিল ক্রাসনাদার বিমানবন্দর অভিমুখী ট্যাক্সিতে চড়ে বসি। ওয়ান ওয়ে জার্নি। যখনই মনে হল আর ফিরে আসব না, বুক প্রচন্ড ব্যাথায় মোচড় দিয়ে ওঠে, মনে হল নাড়ীর বন্ধন ছিঁড়ে যাচ্ছে। ট্যাক্সিটি ধীরে ধীরে ১০ নম্বর ছাত্রাবাসের সীমানা প্রাচীরের গেটটি পার হয়ে খোলা প্রান্তরের পথ ধরে ছুটতে থাকে আর আমি বারবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায় আমার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়টিকে। কিছুক্ষণ পরেই দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায় I ওই মূহূর্তে কল্পনারও অতীত ছিল আর মাত্র পাঁচ বছর পর সোভিয়েত রাষ্ট্রটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে উলঙ্গ পুঁজিবাদ, যে সোভিয়েত রুশ সমাজটিকে আমরা দেখে এসেছি তার খোল-নলচে পাল্টে যাবে। স্বকীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনধারা ও মূল্যবোধ পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যের পানে ধাবিত হওয়ার দৌড়ে অনেক পরিবর্তনের সঙ্গে মিল রেখে বদলে যাবে আমাদের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিরও নাম – কুবান রাষ্ট্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রুশ ভাষায় Кубанский государственный аграрный университет, ইংরেজিতে Kuban State Agrarian University. কিন্তু আমাদের হৃদয়ে অমলিন ও সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে কুবান কৃষি ইনস্টিটিউট এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন রাষ্ট্রটি।